# সনচরি

জয়ন্ত ব্রহ্মচারী

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ :
পৌষ : ১৩৬৮

প্রকাশক :
প্রসুন কুমার বোস
সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ ব্লক :
সি. বি. এইচ. প্রসেস ( ক্যালকাটা
কলকাতা-৭০০০০২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ প্রাইমা প্রেস,
কলকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রাকর :
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

নীরেট আঁধার।

নীরব নিশুতি রাত।

গা ছমছমে বাতাস।

জনমানবশূন্য রাস্তাঘাট।

পরিবেশ ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠছে। এটা যেন মর্তের নয়, কোনো নরকের রসাতল।

ভয় আর ভয়।

শুধুই ভয়।

কেন?

কিসের জন্যে?

সবই অজানা।

এ গাঁয়ের মানুষজন সবই নতুন। কেউ কিছু জানে না। কেউ কিছু বোঝে না।

এখানে বসতি গড়ে কি যে বিপদে পড়েছে সব, সে আর বলার কথা নয়। কে-ই বা বিচার করবে! কে-ই বা পথ বাতলে দেবে! সকলের একই অবস্থা। আতঙ্কে ত্রাসে জড়সড়। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ। মাটির বাড়ি খোড়ো বাড়ি টালির বাড়ি—সবারই দশা একরকম।

কার সাধ্যি যে সামনে দাঁড়ায়! এই ভীষণ ভয়কে তাড়ায়।

ঘরের ফাঁক-ফোকরে চোখ রেখে রেখে দেখে সবাই। কে যেন আসছে।

কি করে বুঝতে পারছ?

কেন, মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে মাটির বুকে। মাটিতে কান রেখে শোনো। তুমিও শুনতে পাবে। আস্তে। আস্তে। খুব আস্তে। একেবারে দ্রুতগতি নয়।

বিদ্যুতের মতো একটা চমক ঝিলিক মেরেছে।

বিদ্যুৎ নয়, মশালের আলো।

আলোটা যেন হাওয়ায় ভাসছে। দুলছে। হেলছে।

শুধু হাতের মুঠিটা দেখা যাচ্ছে।

আবছা আবছা সর্বাঙ্গ।

কার মুখচোখ ঠিক বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। চেনা নয় এটা ঠিক। অচেনা। অচেনা।

অজানা মানুষটির পা থেকে মাথা অবধি শাদা কাপড়ে ঢাকা। অল্প দেখে যতটা মনে হয়, শাড়ি। শাদায় কালো পাড়। স্ত্রীলোক।

এতগুলো পুরুষ-মরদ আছে গ্রামে, এদের হিম্মত বলে কিছু নেই। একটি স্ত্রীলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে কেন বুক কেঁপে ওঠে?

প্রতি অমাবস্যার রাতেই যদি অকারণ একটা বড় আতঙ্কে ডুবে থাকে মানুষের মন, কদিন সে স্বাভাবিক থাকতে পারে? কদিন সে বাঁচতে পারে? নিজের বা অন্যের কি কাজ করে যেতে পারবে সে?

কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। বেহায়া বেশরম। ধিক্কার দিলেও চেতনা আসে না।

মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরতে গেলে ছেলেরাই শাড়ির আঁচল ধরে টেনে মুখে হাত চাপা দিয়ে বসিয়ে রাখে।

যে আসে, তার নাকি চোখ ভয়ঙ্কর। দু চোখের তারা দিয়ে আগুনের হলকা বেরিয়ে এসে সর্বশরীর জ্বালিয়ে দেবে। স্পর্শে শরীরে দ্বিগুণ জ্বালা। ভয়। তার নিশ্বাসের ছোঁয়ায় নিশ্বাস বন্ধ। শরীরের সর্ব শক্তি হরণ।

কি ভয়ঙ্কর অবস্থা।

একি কোনো প্রেত আসে কি প্রেতলোক থেকে! না, কোনো অতৃপ্ত আত্মা! না অভিশাপ! মর্মভেদী কাতর কান্না! যন্ত্রণা!

সত্যি সত্যি একি প্রতিশোধ!

মূর্তি ধরে আসে। কার ওপর!

কাকে! কাকে! কাকে!

তাকে তো বার করে দিলেই হলো ওর সামনে।

সন্তুষ্ট চিত্তে ও ফিরে যায়। প্রতি অমাবস্যার রাতে এ উৎপাত সহ্য করতে হয় না আর কাউকে।

ও আসছে। এক একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। চুপচাপ। কিছুক্ষণ। আবার অন্য ঘর। পরের ঘর। ঘর আর ঘর।

মাঝে মাঝে যে কোনো গাছকে সামনে পাচ্ছে, জড়িয়ে ধরছে। নিশ্বাস, শুধু একটা মাত্র নিশ্বাস। দীর্ঘ নিশ্বাস। বুকের রক্ত হিম করা নিশ্বাস। একি কোনো অতৃপ্ত আত্মা!

কদম গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে খানিক। তারপর চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। বুকে পাথর পড়ছে যেন। কি একটা পদক্ষেপে হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দেবে বুঝি।

এত রাগ, এত অস্থিরতা কেন?

ব্যর্থতা?

পুকুরপাড়ের দিকে এগোচ্ছে।

উত্তরে বাতাসে বুঝি কার হাতছানি শুরু হয়ে গেছে। এত ঢেউ, এত জোরে শব্দ। সমুদ্র নেমে এসেছে কি পুকুরটায়?

নিঝঝুম রাত বলেই কি অল্প শব্দ বেশি শোনাচ্ছে?

হবে বা।

চলে যাচ্ছে। যে এসেছে সে চলে যাচ্ছে।

এসেছে দক্ষিণ দিক থেকে। পাশাপাশি দুটো গ্রাম। মাঝখানে হাত ছয় রাস্তা। দেখেছে। ঘুরেছে। চলেছে। আবার ফিরে যাচ্ছে। দক্ষিণমুখো।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সবাই। আপদ বিদেয় হয়েছে।

কিন্তু পরের অমাবস্যায়? আবারও তো এই আপদের আগমন নিশ্চয়ই হবে। প্রতি অমাবস্যার রাত চলে যেত এই ভাবেই। শেষ কবে? কোথায়?

সব শেষ হলে কি এর শেষ? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। জনায় জনায় জিগ্যেস করেও জবাব মেলেনি। এক একটা মুখ থেকে নিমেষে রক্ত সরে গেছে বুঝি। গলা শুকিয়ে কাঠ। ভাষা বেরতে সাহস করে নি।

অনেকেই কানাঘুষো করে, হয়ত কোনো অপদেবতা, নয়তো সনচরি কি লুকিয়ে লুকিয়ে আসে সত্যি?

গাঁয়ের মোহ ছাড়তে পারে নি হয়ত।

আচ্ছা, গা ঢাকা দিয়ে আসবে কেন সনচরি?

অত দুঃসাহসী মেয়ে! ওর কিসের ভয়? কার ভয়? কার পরোয়া করে ও?

ওতো এমনিই বুক ফুলিয়ে আসবে যাবে।

চুপ। চুপ। চুপ।

সনচরি শুনতে পাবে। বুঝতে পারলে আর রক্ষে নেই। ধড়ে কারও মুণ্ডু থাকবে কি না সন্দেহ। ও সাংঘাতিক।

মানুষের মনের কথা বুঝতে পারে, যত দূরেই থাকুক না কেন।

এক সঙ্গে অনেক অনেক প্যাঁচা ডাকছে কেন?

এসব আলোচনা না করাই ভালো। মা ছেলেকে বুকে চেপে ধরছে। স্বামীর মুখে আঙুল। স্ত্রী চোখ বুজেছে। মনে হয়েছিল এ অশুভ রাত কেটে গেছে। আলোচনায় নতুন করে এগিয়ে আসছে বড় বড় হাত বাড়িয়ে। জাপটে ধরবে বুঝি সবাইকে।

ভেসে আসছে ভয়াবহ কান্নার সুর। এ কি মানুষের কান্না?

না-না তা তো নয়, শকুনির বাচ্চার কান্না। কান পাতা যাচ্ছে না। একসঙ্গে অনেক

অনেক। আচমকা আকাশের গর্জন। কড় কড়—কড়াৎ। বিদ্যুতের চমক। ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব।

এই সঙ্গে কুকুরের করুণ আর্তনাদ! ভয় কি ওরাও পেয়েছে? ভয় কি ওদের চোখেও ভেসে উঠছে?

জন্তু-জানোয়াররাও কি ভয়কে ভয় পায়?

নিশ্চয়ই পায়।

আবহাওযাটা বড্ড ভারী। বড্ড থমথমে। আর পারা যাচ্ছে না। রাতের প্রহর কি শেষ হবে না?

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুকে গলায় একটা চাপ। কিসের চাপ?

একি কোনো অশুভ শক্তির প্রভাব? না শুধু ভয়েরই ফসল?

যা ঘটছে, তা কি সত্যি? না মিছে কল্পনা! মনগড়া?

সব জিনিসেরই একটা কাবণ থাকে।

মনগড়াই হোক, কল্পনাই হোক, জল্পনাই হোক—একটা কিছু কারণ তো আছে নিশ্চয়ই।

খুঁজে বার করতে হবে। কিছু নয় বলে হেসে উড়িয়ে দেয়াটা কোনো ব্যাপারেই উচিত নয়।

সবই আছে।

সবই সত্যি।

আবার সবই নেই।

সবই মিথ্যে।

একটা গান ভেসে আসছে না বাতাসে!

*ঝুটে জগ কি*
*ঝুটি প্রীত...*

এর পরেরটা কি হওয়া উচিত?

*সাচ ভাও মে*
*সাচ গীত...*

রাত ভ'র দুঃস্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন।

মধুবনীর গাঁয়ের শেষ দিন থেকে ময়ূরের ডাক এসে বাজছে কানে।

ভোরের সংকেত।

ওটা কি সনচরির ময়ূর?

সনচরি কে?



শাওনের আকাশে কালো মেঘের পাশে শাদা মেঘের আনাগোনা চলেছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে মাটির বুকে। গাছের পাতায়। পুকুরের জলে। সাঁতার কাটছে হাঁস। সাঁতার দিচ্ছে জলঢোঁড়া সাপ। পেখম তুলে নাচছে ময়ূর।

এক দুই তিন চার।

চার তিন দুই এক।

কদম গাছের শক্ত ডালে দুপাশে দড়ি দিয়ে দোলনা বাঁধা। দড়িতে ফুলের মালা জড়ান।

চতুর্দিকে সবুজে সবুজ। সবুজের নতুন রূপ গাছেব পাতায়। বৃষ্টির জলে চান করে যেন ঘন থেকে ফিকে হয়েছে। গায়ের ময়লা ধুয়ে চলে গেছে। সুন্দর শোভা।

কদম গাছের ডালে ডালে ফুল।

শ্যামলা প্রকৃতি মনোহারিনী রূপে সেজেছে।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মারছে সোনালী রুপোলী রোদের আভা।

প্রকৃতিরই সাজে সেজে এসেছে সনচরি। সবুজ ঘাগরা। সবুজ চোলি। সবুজ ওড়না। পায়ে সরু সরু রুপোলী মল। হাতে হাতির দাঁতের চুড়ি। গলায় সবুজ পাথরের মালা। রুপোর জমিতে সবুজ পাথর বসান লকেট।

অষ্টাদশী রূপসী সনচরী।

দোলনায় বসে দুলছে। দু হাতে দু পাশের দড়ি ধরে আছে। ডান পায়ের ওপর বাঁ পায়ের পাতা।

শ্রাবণে কাজরি উৎসব চলেছে। গাছে গাছে দোলনা বাঁধা। অন্য দোলনায় অন্য মেয়েরা বসে দুলছে।

গলা ছেড়ে কাজরির গান গাইছে সনচরী।

ওর গান শোনার পর ওর সুরে ওর কথায় গলা মেলাচ্ছে অন্য মেয়েরা।

এ যেন এক নতুন রাজ্য। অশান্তির রাজ্যর মধ্যে শান্তির রাজ্য গড়ে উঠেছে। অপূর্ব পরিবেশ।

এখানে মেয়েদেরই আনাগোনা বেশি। পুরুষের প্রবেশ এই গাঁয়ের এ জায়গায় নিষিদ্ধ।

দূরে দূরে মেলা বসেছে।

খেলনা, খাবার, নাগরদোলা, খেলার মেলা।

বাইরে থেকেও অনেকে এসেছে।

মধু ঝরা কণ্ঠে সনচরী গাইছে—

*আয়ে শাওন কে মাহিনা*
*ঝুলে কৃষ্ণ মুরারী না*
*কদম ডারি মে*
*লাগি হিলোরা*
*ঝুলে মোহন না।*
*কোন ইযে ঝুলে*
*কোন ঝুলাওয়ে*
*পকডকে ঝুল্মনা*
*বাধা ঝুলে কৃষ্ণা ঝুলাওয়ে*
*দেখে সখিয়াঁ না*

*শাওনের দোলনায় দোলে*
*রাধিকা শ্রীমতী*
*উত্তরে দক্ষিণে দোলা*
*কৃষ্ণ শ্রীপতি*
*হাসিতে লুটিয়ে পড়ে*
*সখিদের নেই বুঝি*
*কোনো গতি...*

পাশের গ্রামের বড় গুণিন অগ্নিদেব।

অগ্নিদেবকে এনেছে এই গ্রামেরই মুখিয়া প্রধান।

কেন?

সে সব কথা এখন থাক।

অনেক অনেক ব্যাপার।

জানা যাবে পরে পরে।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে সনচরিকে অগ্নিদেব।

এই সে!

মায়াবিনী, ডাইনি, শয়তানি, জাদুকরি—সনচরি!

দেখে তো মনে হয় কোনো দেবকন্যা বসে আছে। যেন সত্যিকারের শ্রীরাধিকা। ওর পাশে একটা কৃষ্ণকে এনে বসিয়ে দিলেই হয়।

তার কাছে তো যাওয়ার উপায় নেই। মন জুড়নো প্রাণ জুড়নো গানে মুগ্ধ অগ্নিদেব নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

লোকের সাবধান-বাণী যে দু-একবার স্মরণে না এসেছে, তা নয়। এসেছে।

সনচরিকে দেখে যা বয়েস মনে হয়, তা কিন্তু ওর আসল বয়েস নয়। ওর বয়েসের গাছ-পাথর নেই। ও জাদু জানে। মায়াজালে লোককে মুগ্ধ করে। ছেলেবুড়ো ওর জন্যে পাগল।

ওর দেহে সম্মোহন, কণ্ঠে সম্মোহন, স্পর্শে সম্মোহন।

ওর ফাঁদে একবার পড়লে তার আর নিস্তার নেই। মুক্তি নেই।

অতএব নৈব নৈব চ কদাচন।

সাধু সাবধান।

সব বিস্মরণ হয়ে গেছে অগ্নিদেবের।

কখন নিজের অজানতেই নিষেধ উপেক্ষা করে একেবারে সনচরির সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে, নিজেরও খেয়াল নেই অগ্নিদেবের।

সনচরির মাথার দিকে তাকাতেই চমকে উঠেছে।

হৃৎকম্প।

একি মনসা দেবী নাকি!

ফণা তুলে সাপও দুলছে সনচরির দোলার সঙ্গে সঙ্গে।

সর্বনেশে ব্যাপার।

এমন অবস্থা, নড়াচড়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে বুঝি। না পেছোতে পারছে, না পালাতে।

চোখ বুজে এক ভাবে গেয়েই চলেছে সনচরি। কোনো খেয়ালই নেই কোনো দিকে।

গাইছে আর দুলছে।

দুলছে আর গাইছে।

আচমকা সাপটা লাফিয়ে পড়েছে অগ্নিদেবের ঘাড়ে।

হাতের ঝটকায় ফেলে দিতেই আক্রোশে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে পায়ে।

অগ্নিদেব চিৎকার করেই পড়ে গেছে। —সাপে কামড়াল। সাপে কামড়াল।

বাঁচাও। বাঁচাও।

সমস্ত মেয়েরা দোলনা থেকে নেমে পড়েছে। ওঝা ডাকার জন্যে সবাই ব্যতিব্যস্ত।

সনচরি নিজের ওড়না ছিঁড়ে পর পর তাগা বেঁধেছে অগ্নিদেবের পায়ে।

নির্দ্বিধায় ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে টেনে টেনে বিষ বার করেছে। রক্ত বেরচ্ছে। তাজা রক্ত।

সনচরির ঠোঁট রক্তে মাখামাখি।

সকলে অবাক। হতভম্ব।

অগ্নিদেবের দু চোখে বিশ্বের বিস্ময়।

কে? কে? কে? কে এ? এ ডাইনি? এ শয়তানি? এ কি মায়াজাল? সত্যি তাকে সাপে কামড়ায় নি?

না, না। সত্যি সাপের দাঁত তার পায়ে গর্ত করে দিয়েছে।

একমাত্র মা-ই নিজের জীবন বিপন্ন করে, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে ছেলেকে বাঁচায়। মা-ই এটা পারে। মায়ের দ্বারাই সম্ভব। অন্য কারও দ্বারা নয়। অগ্নিদেবের তাই মনে হয়।

সনচরির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কে? সত্যি সত্যি কে?

বিশ্বের সব মায়ের মমতা এরই মধ্যে কি এসে গেছে সনচরির দেহে-মনে, এই সময়ে?

অগ্নিদেবের জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে?

গ্রামের সব মেয়েরাই দোলনা থেকে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে সনচরিকে ঘিরে।

অগ্নিদেবের দিকে সকলের বিষ-নজর।

ধরমিয়া থপাস করে বসে পড়েছে সনচরির পাশে। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে জল আনিয়ে ঠোঁট মুখ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। আর ফিস ফিস করে কানের কাছে মুখ এনে বলছে, তুই কি নিজেকে এই ভাবে শেষ করতে চাস? কেন?

কেন এইভাবে শেষ করবি? আমি থাকতে এটা হতে দেব না কখনও। তোর পেটে বিষ চলে গেলে কে দেখত! বাঁচাতে চাস ভালো লোককে বাঁচা। সর্বনেশে শয়তানটাকে কেন বাঁচাতে গেলি? তুই জানিস না সনচরি যে, ও কতখানি বদ। তোর ওপর কতটা আক্রোশ। ওফ! সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার বুকের মধ্যে এখনও ধড়াস ধড়াস করে ওঠে! তোকে কি করে বলি! সে কথা তোকে বলা যায় না সনচরি।

দূর থেকে সুদাম এইসব দেখছিল।

নিজেকে স্থির রাখতে পারে নি আর।

কাজরি গানের এলাকা নিষিদ্ধ জেনেও সে ঢুকে পড়েছে।

এসে দাঁড়িয়েছে সনচরির কাছে।

আহত কণ্ঠস্বর।

বলেছে, তুমি ভালো আছ সনচরি?

ঘাড় তুলে আড়চোখে তাকিয়েছে সনচরি। মুচকি হেসে বলেছে, দরদি আছে তাহলে!

ধরমিয়ার সারা শরীরের রক্ত চনমন করে মাথায় উঠেছে। জ্বলে উঠেছে ভেতরের আগুন।

সনচরির চোখের দিকে তাকিয়েছে একবার। আর একবার চোখ ঘুরিয়েছে সুদামের মুখের দিকে।

ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে গালে।—শয়তানি কোথাকার!

পরমুহূর্তেই সনচরির মাথাটা বুকে টেনে নিয়েছে ধরমিয়া।

গালে হাত বুলোচ্ছে আর কাঁদছে।

দু চোখের জল টস টস করে ঝরে পড়ছে সনচরির মাথায় গালে।

সনচরির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে।

কান্না ভেজা গলায় ধরমিয়া বলে চলেছে, তোকে না পারি ছাড়তে। না পারি সইতে।

মরণ হলো না কেন তোর! হলে আমি নিশ্চিন্ত হই। ভাবতে পারি নি কখনও জীবনে তুই আমার পথের কাঁটা হবি একদিন।

ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমানের গলা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে এসেছে ধরমিয়ার কথায়।

অনুরোধের সুরে হাত দুটো ধরে বলেছে, তোর জন্যে তো অনেকেই পাগল। তোকে দেখার লোক অনেক পাবি তুই। কারও দিকে একবার তাকালেই ছুটে আসবে, তোর পায়ের তলায়।

আমার?

আমার কি দশা হবে?

আমার তো এই একটাই ঘরের মানুষ—সুদাম। আর একটাই ছেলে—সবে দু বছরে পড়েছে। সে দুটোকে ভিক্ষে দে ভাই। কেড়ে নিস নি। দোহাই তোর।

দু বছরের কিশোরা মাঈরে মাঈরে চিৎকার করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে

সনচরির কোলে। আধো আধো কথায় বলছে, ধরমিয়া হট যাও। ধরমিয়া হট যাও।

বুকে জড়িয়ে ধরে দু গালে চুমু খেয়েছে সনচরি। —বেটা মোর। জিতে রহ।

নিজের গোলাপি ওড়নায় চোখ মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলেছে ধরমিয়া। —ছেলেটাও আমার নয়। তোর। বলতে পারিস, কি সে আমার মরণ হয়!

হো হো করে হেসে উঠেছে সনচরি। হাসিতে যেন সুরের তরঙ্গ বয়ে গেছে। ধরমিয়া রে, কুছ নহি চাহিয়ে। তোর মানুষ, তোর ছেলে তোরই থাকবে।

সনচরিকে জড়িয়ে ধরে ধরমিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। না, না, না। কিশোরা তোরও ছেলে রে।

না ধরমিয়া। সনচরি একা। একে এসেছে। একা থাকবে। একা যাবে।

অগ্নিদেব একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাগে অগ্নিশর্মা। দু চোখ লাল। কর্কশ স্বর।

চিৎকার করে বলে উঠেছে, তুই মারবার কে? কেন সনচরিকে মেরেছিস? এত বড় স্পর্ধা তোর! তোর কি অবস্থা হয় দেখবি। কতখানি ক্ষমতা আমার জানিস তো।

সনচরিকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে ধরমিয়া। বাঘিনীর আক্রোশে অগ্নিদেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি!

হট যাও শয়তান। তোমার কেরামতি জানতে আর আমার বাকি নেই। সেদিনের কথা, তোমার ষড়যন্ত্রের ঘটনা জীবনে ভুলতে পারব না আমি। নিকাল যাও গাঁও সে।

রাগে ফেটে পড়েছে অগ্নিদেব।—অ্যাত বড় সাহস তোর। গাঁও থেকে তোকে বার করব। আমি যাচ্ছি না। সেদিনের কথা মনে নেই! পায়ে ধরে কেঁদে কি বলেছিলি!

কি ভয় দেখাচ্ছ তুমি আমায়। আমি বলেছিলুম সনচরি মরুক আমি চাই না। ওর মনটা ঘুরুক। কিন্তু তুমি!

তুমি নির্লজ্জ, বেশরম, নির্মম, নিষ্ঠুর।

সেই মুহূর্তে ধরমিয়া তোমাকে ভালো করে চিনে নিয়েছে।



আজ থেকে বেশ কিছু আগের ঘটনা।

ধরমিয়ার 'সেদিন'।

বুকের রক্ত হিম করা মুখ।

ধরমিয়ার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠেছে। কাকে বলবে! শুনবে কে!

দশেরার উৎসব চলেছে। লোকে লোকারণ্য। এ গ্রাম ও গ্রামে মিলনপর্ব চলেছে।

মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে।

মনদীপ সিং আসলে পাঞ্জাবী হলেও সে এখন মধুবনিরই ছেলে হয়ে উঠেছে। সুমধুর কণ্ঠ। রোজ সকালে গান গেয়ে গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

গানে আবেদন, যদি বন্ধুত্বই হয় কারও সঙ্গে, যদি মনের মিলই হয় কারও সঙ্গে বিচ্ছেদ যেন না হয় কখনও। বিচ্ছিন্ন যেন না হয়ে পড়ে কেউ কারও কাছ থেকে। আসা যাওয়াটা যেন বজায় তাকে দু জনের মধ্যে। তাহলেই আনন্দ। তাহলেই শান্তি। তাহলেই সব দুঃখ-কষ্ট মন থেকে মুছে যাবে।

*যে থে কি থে*
*কিসি নাল পেয়ার পাইদা*
*ঘেরাটোরা বাখনা জরুর চাইদা*
*ও যে মিলিয়েতে সজনা মিলিয়েতে*
*সারা দুখ উব যাইদা*
*সারা দুখ ভুল যাইদা...*

গানটা গাইছে মনদীপ সিং।

গানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা নাচছে। হাততালি দিচ্ছে। আনন্দের হিল্লোল বাতাসে-মাটিতে।

সূর্য তখনও কমলা নদীর জলে ডোবে নি। সনচরি ছুটে এসে ধরমিয়ার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে।

আনন্দে ধরমিয়া সনচরিকে সিঁদুর পরাতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়েছে।

সনচরি হেসে উঠে বলেছে, দিতে এসে ফিরিয়ে দেয়াটা ভালো নয়। এখনই পুকুরে নামব সাঁতার কাটতে। ধুয়ে ফেললেই চলবে। দিলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। এত সংকোচ কেন?

সনচবি ধবমিয়াকে টানতে টানতে পুকুরের পাড় বেয়ে জলে নেমেছে।

পাড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েরা হাততালি দিচ্ছে।

দুজনেব কি সাঁতার কাটার ধুম। ওবা দশ বছর বয়েসে নেমে এসেছে। একজন এগোচ্ছে, আর একজন পেছচ্ছে। আবার দ্বিতীয় জন এগোচ্ছে, প্রথম জন পেছচ্ছে। জলে হাত পড়ছে ছলাৎ ছলাৎ। জলের ফোয়াবা ছিটকোচ্ছে পাড়েব মেয়েদেব গায়ে। মেয়েদের মধ্যে হাসাহাসি। ঢলাঢলি। গলাগলি।

সাঁতার কাটতে কাটতে দু জনে গলা মিলিয়ে প্রাণ খুলে গাইছে—

*না ছেড় গালি দুঙ্গি*
*ভর নে দে গাগরি*
*সব সখিয়াঁ নিকলি ঘরসে*
*ম্যায় শাশ ননদ কি ডরসে*
*তেরে বংশী ছিনু লুঙ্গি...*

ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব দুজনেরই।

ফিরে এসেছে আবার।

পাড়ে উঠেছে ওরা।

সনচরির দিকে ধরমিয়া এক একবার তাকাচ্ছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে।

সনচরি ধরমিয়ার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, তুই কি ভয় পাচ্ছিস! আমি ঠিক দড়ির এপার থেকে ওপার অবধি চলে যাব।

চাপা গলায় আস্তে আস্তে সনচরির ডান হাতটা ধরে দোলাতে দোলাতে বলেছে ধরমিয়া, আজ না-ই বা দেখালি দড়ির খেলাটা।

কেমন করে হয় বল! এত লোক আশা করে দাঁড়িয়ে আছে খেলা দেখবে বলে। তাছাড়া কথা দেয়াও হয়ে গেছে। দড়িটা বাঁধাও হয়ে গেছে এ তালগাছ থেকে ও তালগাছ অবধি।

ধরমিয়ার মুখ দিয়ে আর কোনো কথাই বেরয় নি। ছলছলে দু চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েছে কেবল।

প্রার্থনা কি?

সনচরির জন্যে মঙ্গল প্রার্থনা?

সনচরি ছুটে চলে গেছে তাঁবুর মধ্যে, নতুন সাজে সাজবে বলে।

গ্রামে মেলা বসেছে।

ঘোড়দৌড়, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, নাচের আসর, গানের আসর। দশেরা উৎসব।

শিউলি ফুলের গন্ধ বাতাস মাতিয়ে তুলেছে। দূরে দূরে শাদা কাশফুল। এখনও আকাশের আলো রয়েছে। তবুও চতুর্দিকে হ্যাজাকের আলো জ্বলে উঠেছে। ঢাক-ঢোল-কাঁসর-বাঁশি বাজছে।

তিন দিন পুজোর পর দুর্গা-মায়ের বিসর্জন।

সনচরিদের গাঁয়ে। তীরথ-মার বাড়িতে দুর্গা পুজো হয়েছে।

তীরথ-মা বুঝিয়েছে সবাইকে—অসুর মরেও মরে না। মহিষাসুরের ব্যাপারটা দেখ। সে এক এক বার মরছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপ ধরছে। কখনও মানুষ। কখনও সিংহ। কখনও হাতি। কখনও মোষ। কখনও মহিষাসুর।

অতএব তোমরা কেউ ভেব না তোমাদের রাগদ্বেষ একবারের জন্যে কমলেও চিরদিনের জন্যে কমে যায়। সময় পেলেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সদা-সর্বদা সচেতন হয়ে থেক। মহিষাসুর বধে দেবী সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন।

পাশের গ্রামে মহিষাসুর পুজো হয়েছে। দেবী সেখানে অনুপস্থিত। গুণিন অগ্নিদেব পুজো করেছে।

অগ্নিদেব বক্তৃতা করে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে—অসুররা বিজ্ঞানী। অসুরদের মতো তোমরা সকলে ক্ষমতার সাধনা করবে। দেবতাদের কাছ থেকে তবে সব ছিনিয়ে নিতে পারবে। দেখ মহিষাসুর দেবী পুজোর আগে নিজের পুজো ছিনিয়ে নিয়েছে। জায়গা দখল করে নিয়েছে। সকলে গলা মিলিয়ে বল, মহিষাসুর কি জয়।

এ গ্রাম ও গ্রাম কেঁপে উঠেছে মহিষাসুরের জয়ধ্বনিতে। সনচরিদের গাঁয়েই বড় পুকুর। তাই ধরমিয়ার শ্বশুরবাড়ির গাঁ থেকে মহিষাসুরের মূর্তি এনে বিসর্জন হলো সনচরিদের গাঁয়ে।

গানের আসর বসেছে কাঠের তক্তার ওপর শতরঞ্চি বিছিয়ে।

আসরে গান গাইছে মনদীপ সিং।

*আসমা কি হুসনে চান্দ তুমহারে*
*দিল কি রোশনি তুম হমারে*
*আসমা কি সিতারেঁ আঁখে তুমহারে*
*মেরি আঁখে হ্যায় জিনা হমারে*

*আসমা কি দৌলত হ্যায় তুম হমারে*

*নীল আকাশের সৌন্দর্য জোছনার চাঁদ*
*আমার হৃদয়ের আলো তুমি আমার*
*আকাশের তারা আঁখি তোমার,*
*তোমার বাঁচিয়ে রাখাটাই আমার দুনয়ন*
*আকাশের ঐশ্বর্য সবই তোমার*
*আমার ঐশ্বর্য তুমি আমার*

শ্রোতাদের মধ্যে হাততালির পর হাততালি।
বাহবা। বাহবা। বাহবা।
মনদীপ সিংয়ের গানের এবারে উত্তর দিচ্ছে বীরজ সিং।
বীরজ সিং মনদীপ সিংয়ের ভাগ্নে।
তিনতারে ছড় টানছে বাজিয়ে। ঢোলক বাজছে। সঙ্গে সিঙ্গল হারমোনিয়ম।

*আসমা হ্যায় তু মেরে*
*জমিন ম্যায় হুঁ*
*বাহর হ্যায় তু মেরে*
*বন্দি ম্যায় হুঁ*
*জিন্দেগি হ্যায় তু মেরে*
*জমানা ম্যায় হুঁ*
*আশিক হ্যায় তু মেরে মহব্বত ম্যায় হুঁ*

*তুমি আকাশ আমি মাটি*
*তুমি মুক্ত আমি বন্দি*
*তুমি প্রাণ আমি সময়*
*তুমি প্রেমিক আমি প্রেম*

আবার হাততালি। আবার বাহবা। বাহবা। বাহবা।
হঠাৎ সব নিস্তব্ধ নিঝঝুম।
ফিস ফিস কথা কানাকানি।
সনচরি আসছে।
হ্যাজাকের আলো জোর করে দেয়া হচ্ছে।
সনচরির কালো কুচকুচে চুলে আঁটসাঁট বিনুনি। পিঠ বেয়ে ঝুলছে। পরনে

সোনালী পাজামা আর কুর্তা।

মই বেয়ে দড়ির ওপরে পা রেখেছে সনচরি।

গিসগিস করছে লোক। সকলের দৃষ্টি সনচরির ওপরে। তার পায়ের দিকে।

ছন্দে ছন্দে চলেছে সনচরি। আগেকার রাজস্থানী জাদুকরি সনচরিরই মতো।

স্তব্ধ বাতাস।

মানুষের রুদ্ধ নিশ্বাস। ধরমিয়া বুক চেপে বসে আছে। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কাকে খুঁজছে! কাকে চাইছে!

আচমকা সুদামকে দেখা যাচ্ছে সনচরির চলার ছন্দে, ঠিক দড়ির নিচে নিচে। সেও চলেছে।

সকলেরই মনে মনে প্রশ্ন, ও আবার ওখানে কেন?

সনচরি হাসিমুখে দড়ির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

যেন শূন্যে বাতাসে হেঁটে চলেছে।

হঠাৎ সমবেত দর্শকের চিৎকার—গির পড়তা হ্যায়। গির পড়তা হ্যায়।

চিৎকার করে উঠেছে ধরমিয়া—বাঁচাও। বাঁচাও। সনচরিকো বাঁচাও।

লোকেদের প্রশ্ন—কারা এমন কাজ করল! কে দড়ি কাটল?

অত উঁচু থেকে সনচরি কিন্তু মাটিতে পড়ে নি।

খুব বেঁচে গেছে সুদামের জন্যে।

সুদাম নিজের বুক পেতে ওকে ধরে না ফেললে সনচরিকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

মানুষের প্রবৃত্তিকে বলিহারি যাই। কেউ কারও ভালো দেখতে পারে না। ভালো সহ্য করতে পারে না।

কুটিল মনের কুটিল চিন্তা। আর সমস্তটাতেই কুভাব দেখা।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি এতটুকু।

সহানুভূতির জায়গায় ভালোবাসার জায়গায়, সুখি হওয়ার জায়গায় অনেকেই দুঃখি হয়ে উঠেছে। —ছ্যা ছ্যা ছ্যা। গ্রামের বে-ইজ্জত, গ্রামের বদনাম সনচরি।

এত জনের মাঝে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়েছে।

জিভ কেটে মেয়েরাও বলে উঠেছে—ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে! লোককে দেখিয়া দেখিয়ে বুকে পড়াপড়িতে কি বাহাদুরি! বলতে ঘেন্না কইতে ঘেন্না!

মেয়ে জাতের কি অপযশ।

অনেক মহিলা ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। মুখ দেখাবে কি করে!

যা কাণ্ড করেছে সনচরি, মেয়ে জাতের কলঙ্ক। মুখ দেখান দায়। কেন মরতে

দেখতে এসেছিল দড়ির খেলা। বাড়ির মরদদের কাছে কি আর মান-সম্মান রইল তাদের! এসব মেয়েরা মরেও না তো!

একজন চিৎকার করে বলে উঠেছে, মরণ হলে তো হয়েই গেল। জ্বালাবে কি করে সকলকে!

এসব তৈরি করা। ঐ ডাইনি সনচরির মতলবেই এসব ঘটেছে। ও-ই নিজের লোক দিয়ে দড়ি কাটিয়েছে সুদামের বুকে পড়বার জন্যে।

তাইতো বলি, সুদাম ছোঁড়াটা এখানে ঘুরঘুর করছিল কেন?

বুকে পড়ে দুজনের কি হাসাহাসি!

দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ান আর হাসি। যেন বিশ্ব জয় করেছে।

ঘেন্না। ঘেন্না। ঘেন্না।

ধরমিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে আবার নিজের বুকে ঠেকাচ্ছে।

সনচরি বেঁচে গেছে মৃত্যু-ফাঁড়া থেকে।

ধরমিয়া সুখি। খুশি। খুব খুশি।

কিন্তু তবু মনের ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে যাচ্ছে ওদের হাসি দেখে।

সুদাম কি সত্যি তার আর হবে না কোনো দিন!

সত্যি কি সনচরি সুদামকে ক্রমে ক্রমে, কেড়ে নিচ্ছে তার কাছে থেকে?

অগ্নিদেব যখন এই দড়ি কাটার পরামর্শ করেছে, ধরমিয়া বাধা দিয়েছে।

পায়ে ধরে কেঁদে বলেছে, ও মরে যাক আমি চাই না। একাজ কোরো না। ও আমাকে বাঁচিয়েছে।

দু বছরের কিশোরাকে পাড়ে রেখে চানে নেমেছে পুকুরে।

হঠাৎ কিশোরা পাড় থেকে গড়িয়ে জলে পড়ে যায়।

কিশোরাকে ধরে জল থেকে উঠতে পারছিল না ধরমিয়া। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করেছে।

কি সে যেন টানছে নিচের দিকে। পায়ে যেন কি আঁটকে যাচ্ছে। ছাড়াতে গিয়েও ছাড়াতে পারছে না।

বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার করছে।

বট গাছের ডালে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল সনচরি।

রাজস্থানী গানের সুর।

*নাথ গজবক্ষ কো ক্যায়সে ছোড়ায়...*

ধরমিয়ার চিৎকার কানে যেতেই বাঁশি ছুড়ে ফেলে লাফিয়ে জলে পড়েছে মা-ছেলেকে উদ্ধার করার জন্যে।

গায়ের যত শক্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে ধরমিয়া আর কিশোরাকে বাঁচানর জন্যে।

সে যাত্রা সনচরির জন্যে ধরমিয়া কিশোরা প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

অগ্নিদেব, ধরমিয়া বেইমান হতে পারবে না। ওর মন ঘুরিয়ে দাও। ও যেন সনচরিকে মন থেকে ভুলে যেতে পারে।

সনচরিও যেন ওকে ভুলে যায় চিরদিনের মতো।



নীলাম্বর দাদু সনচরির বিপদের কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে এসেছে।

বাড়ি নিয়ে গেছে সনচরিকে।

ভর্ৎসনা করেছে—প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনও দড়ির খেলা দেখাবি নি। আমাকে আর কষ্ট দিসনে তোরা। বাহাত্তরে পড়তে যাচ্ছি। বয়েস তো কম হয় নি। বুক তো ইস্পাত নয় রে। কত সহ্য করব!

তোর দিদা—স্বর্ণশিখা চলে গেছে। তার কথা সে রাখতে পারে নি।

সে কি বলেছিল জানিস! দুজনে যেন এক সঙ্গে মরি! আমি ম'লে তোমায় দেখবার কেউ থাকবে না। আর তুমি ম'লে! ঐ একই অবস্থা।

বাঁচাতে পারলুম কৈ!

মাথা নিচু করে ভালো মেয়ের মতো সনচরি দাদুর কথা শুনে যাচ্ছে।

দাদু নিজের না হলেও অনেক অনেক বড়।

আপনার চেয়েও আপনজন।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে নীলাম্বর দাদু! বসে পড়েছে সোফায়। দরদর করে ঘামছে।

তোয়ালে করে মুছিয়ে দিচ্ছে সনচরি। বলেছে, দাদু, আমি আর যাব না। তুমি শান্ত হও। তুমি সুস্থ হও। তুমি ভালো থাক।

গ্রামের শেষের দিকে নির্জনে নিশ্চিন্তে থাকবে বলে কলকাতা থেকে চলে এসে এখানে দোতলা বাড়ি করেছে নীলাম্বর দাদু।

অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে কলকাতা ছেড়েছে। কলকাতার ধাঁচেই বাড়ি করেছে। সাজিয়েছে। বাড়িতে ঢুকলে মনে যেন না হয় কলকাতা ছাড়া।

নাতনির বয়েসি সনচরি।

নাতনি মনোশোভা।

একমাত্র মেয়ে বিধুরেখার ঐ একটি মেয়ে।

সচেতন হয়ে উঠেছে নীলাম্বর দাদু। কানখাড়া করে শুনছে।

তানপুরাটা বাজছে না! ওপরের ঘরে! দোতলায়!

সনচরি, ভুল শুনছি কি!
না দাদু। ঠিক শুনছ। মাসি গান গাইছে।

*হম পস্তায়ে*
*সজনোয়াঁ হম পস্তায়ে*
*প্রেমী বন কর*
*কুছ নহি পায়া*
*হম নে নীর বহায়ে*
*হরদম এহি সদাকে লিয়ে*
*আপসোস কেয়া কিয়া*
*দিল সে এহি মুদা*
*আপসোস কেয়া কিয়া*
*না কামিয়োঁ নে*
*জিদ মজবুর কর দিয়া*
*অব কহ না পর রাহ*
*আপসোস কেয়া কিয়া*

*আমি খুব ক্লান্ত*
*আপসোসের অন্ত নেই আমার*
*ভালোবেসে কিছুই পাই নি*
*চোখের জলই সার হয়েছে আমার*
*প্রেমিক তুমিই বল সত্যি কিছু পেয়েছি কি!*
*সদা-সর্বদা আপসোস অনুশোচনা*
*আমি কি করেছি?*
*তুমি কোনো উত্তরই দাওনি*
*আমার ব্যর্থ প্রেম নিষ্ফল জেদ*
*তাও তুমি মেনে নিয়েছ*
*কেন? কেন?*
*আমি কি করেছি সে কথাটা*
*বলারও কোনো অধিকার রাখ নি*
*সারা জীবন ধরেই আমার এই আপসোস*
*আমি কি করেছি*

এতক্ষণ কান খাড়া করে গান শুনেছে নীলাম্বর দাদু আর সনচরি।

আজও বিধুরেখার সেই গলা। কি মিষ্টি গলা।

সত্যি! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে নীলাম্বর দাদু, বলতে পারিস কি পেয়েছে ঐ মেয়েটা। কি দিতে পেরেছে সমাজ ওকে! খালি ব্যথা ব্যথা আর ব্যথা! শেষ পর্যন্ত স্মৃতিভ্রম।

ওতো মরেই বেঁচে আছে রে সনচরি। বল। বল। তাই নয় কি!

সে রাতেও গান গাইছিল বিধুরেখা। সেই রাত্তিরের রক্তারক্তি ঘটনা।

কি ভয়ানক দৃশ্য।

দেখা যায় না চোখে।

দেখেই তো স্বর্ণশিখা চলে গেল। সহ্য করতে পারে নি।

দু হাতে মেয়েটার মাথা ধরে জোরে জোরে দেয়ালে ঠুকেছে।

বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। মাথা ফেটে রক্ত ঝরেছে।

অপরাধ কি!

বাপের গায়ে হাত উঠেছে বলে মেয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা বর্বর নৃশংস জামাই।

এটা কি শত্রুতা! প্রতিহিংসা!

প্রতিশোধ নিয়েছে বাল্য বন্ধু নীলাঞ্জন।

পড়াশোনা, খেলাধুলো, একসঙ্গে খাওয়া-খাওয়ি, কত দিন রাত কেটেছে, বুড়ো হওয়া পর্যন্ত। বন্ধুত্বে চিড় খায় নি।

স্বর্ণশিখাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল নীলাঞ্জন। নীলাম্বর তো বাধা দেয় নি।

হ্যাঁ। বাধা দিয়েছে স্বর্ণশিখা নিজে।

পাল্টাপাল্টি ঘরে বিয়ে হয়েছে। ওদের বাড়ির ছেলের সঙ্গে স্বর্ণশিখার মাসির।

মাসিকে কষ্ট দিয়েছে ওরা খুব।

দিদিমার মৃত্যুতে, দাদুর মৃত্যুতে একবারের জন্যেও দেখা করতে পাঠায় নি।

পৈশাচিক ব্যবহার।

মানুষের মনুষ্যত্ব যদি একটুও ভেতরে থাকত, তাহলে এ ব্যবহার করতে পারত না। পারে না।

বিধুরেখার প্রথম বিয়েতে ঘটকালি করেছে নীলাঞ্জন।

বিধুরেখা বিধবা হয়েছে। কিন্তু নেপথ্য থেকে যে কলকাঠি নাড়ছে নীলাঞ্জন, সেটা চেতনায় আসে নি নীলাম্বরের। এমন কি স্বর্ণশিখারও।

বিধুরেখার শ্বশুরবাড়ি থেকে একবারও প্রকাশ করে নি ছেলের হার্টের অসুখ

আছে। কোন জ্যোতিষই নাকি বলেছে, বিয়ে দিলে মেয়ের এয়োতির জোরে ছেলে বেঁচে থাকবে অনেকদিন। দীর্ঘায়ু পাবে।

খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে বিধুরেখার। মেয়ের কাকিমা মাসিমা মামিমারা বরণকুলো হাতে নতুন জামাইকে বরণ করেছে। কে একজন ওদের মধ্যে থেকে বলে উঠেছে, মাকুটা হাতে ধর। কড়ি দিয়ে কিনলাম। দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। হাতে দিলাম মাকু। একবার ভ্যা কর তো বাপু।

বরণের সময় নাপিত সকলকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। ভালোমন্দ লোক থাক, সরে যাও। নইলে ভাতার পুতের মাতা খাবে। ভালো ছেড়ে মন্দ করবে। আমার হাতের মতো হাত হবে। এক পো চালের ভাত ছ মাস খাবে। খুঁটিখাঁটা ছেড়ে দাও, উলু দাও, শাঁক বাজাও।

বরণ-পর্ব, পরিহাস-পর্ব, বিবাহ-পর্বর শেষে বাসর ঘরে ছেলে-মেয়েরা পুরনো দিনের গান গেয়েছে নতুন বরকে আনন্দ দেয়ার জন্যে। সঙ্গে নেচেওছে কেউ কেউ।

*...দেখিস লো সই মজিস নে কো.*
*দেখে বরের বাঁকা নয়ন*
*ছি ছি ছি একি হলো দায়*
*আড় নয়নে মুচকি হেসে*
*আমার দিকে চায়*
*বাঁকা কুঁজ নাচল ধিন ধিন*
*ছি ছি গা করে ঘিন ঘিন*
*ওয়াক থু থু তায় মুলো দাঁতের বাহার কিবা*
*হাসলে পরে মানিক ঝরে*
*বর্ণ হলো কেলে হাঁড়ি*
*চক্ষু কোটরে*
*তাতেও নাগর ট্যারা চোখ ঠাহর...।*

বর-কনে বিদায় নিয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ি। অর্থাৎ বরের বাড়িতে।

প্রবেশের আগে দুধ ওথলান প্রথা। দুপাশে ইট বসিয়ে মাঝখানে কাঠের কুচি দিয়ে আগুন ধরান হয়েছে।

ছোট পেতলের ডেকচিতে দুধ।

দুধ ফুটতে ফুটতে উথলে পড়ছে।

বরের বাড়ির একজন সুবেশা মহিলা নতুন কনেকে প্রশ্ন করেছে, কি ওতলাচ্ছে বৌমা?

কনের কানের কাছে ঐ বাড়ির আর একজন ফিস ফিস করে বলে দিলে, বল, শ্বশুর-শাশুড়ির ধন-দৌলত ওতলাচ্ছে।

পাথরের বড় থালায় রাখা দুধ-আলতায় পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন বউ।

তারপর বর-কনেকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে ছাদনাতলায় দাঁড় করিয়ে বরণ করছে এয়োতীরা। কনের একহাতে কাজললতা। অন্য হাতে খালুইয়ের মধ্যে জ্যান্ত ল্যাটা মাছ।

বরণ শেষে বর-বৌকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওপরে।

আগাগোড়া শাড়ি বেছান মেঝেয়, বসার ঘর অবধি।

বৌয়ের মাথায় কুনকে ভর্তি ধান।

কাপড় মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলছে। পেছনে বর। রুপোব জাঁতি দিয়ে একটু একটু করে ধান ফেলে দিচ্ছে।

ঘরে ঢোকার মুখে হিরের নেকলেস, হিরের চুড়ি আর হিরের দুলে সেজে দাঁড়িয়ে আছে শাশুড়ি। ছেলের মা।

শাশুড়ি নতুন বৌকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বললে, এসো মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।

বরের বাড়ির জ্ঞাতি-গুষ্টিরা বৌ দেখে বললে, আহা হা হা—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুন। সাক্ষাৎ পটে আঁকা লক্ষ্মী নেমে এসেছে মর্তে। কি রূপ! কি চোখ। নাক!

ছেলেও তো আমাদের ভালো। মানিয়েছে ভারি সুন্দর। একেবারে লক্ষ্মী-নারায়ণ দুজনে।

ভেলভেটের গালচে বেছান বিছানায় বসেছে বর-কনে।

ঘর সংসার আর হৃদয়ের পরিচয় মেলামেশা সহজ করার খেলা শুরু হয়ে গেল।

চালখেলা।

বর চাল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বৌ গুছিয়ে তুলে দিচ্ছে।

বৌ চাল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বর কুড়িয়ে গুছিয়ে রাখছে।

এবার টোপরের খেলা।

রুপোর গামলার জল হাত দিয়ে ভালো করে ঘুলিয়ে নিয়ে বরের টোপর আর বৌয়ের শোলার মুকুট থেকে একটু শোলা ভেঙে গামলার জলে ফেলে দেয়া

হয়েছে।

কে আগে যাচ্ছে! কে পরে যাচ্ছে! কার পেছনে কে?

কনের পেছনে বর, না বরের পেছনে কনে?

দেখা গেছে কনের পেছনেই বর। তারপর দুটো একসঙ্গে পাশাপাশি।

ঘরের সকলেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে।

নেচে উঠেছে ননদেরা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বড় ননদ বলেছে, যাক, বাঁচা গেছে। দুজনের মিল থাকবে চিরদিন। ঠাকুর করুন, তাই হোক। ধান-দুব্বো, হিরে-জহরত, সোনা-দানা দিয়ে বড়রা বড়-কনেকে আশীর্বাদ করতে শুরু করে দিয়েছে।

প্রথমে শাশুড়ি নতুন বৌয়ের মাথায় ধান-দুব্বো দেয়ার পর নিজের গলার হিরের নেকলেস খুলে পরিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবেশীদের মুখে মুখে কানে কানে কথা ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে।

মেয়েটার বরাত বটে।

ধন্যি শাশুড়ি।

কলিকালে এমন মানুষও থাকে গা। নিজের হিরের হার খুলে বৌয়ের গলায় পরিয়ে দেয়।

ভাগ্য। ভাগ্য। একেই বলে সৌভাগ্য।

পরের দিন বৌভাতে গা ভর্তি গয়নায় সেজে, বেনারসি শাড়ি পরে আধঘোমটা মাথায় অন্ন পরিবেশন করেছে নতুন বৌ। পেতলের হাঁড়ি থেকে পেতলের হাতায় ভাত নিয়ে নিয়ে, প্রত্যেকের সামনে পাতা কলা পাতায়।



মাস ছয়েক অব্দি বিধুরেখা শ্বশুরবাড়িতে রানির আসনেই বসে থেকেছে। সকলের আদরের বৌ-রানি। তখন নীলাম্বর স্বর্ণশিখা বিধুরেখা—কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি বৌ-রানি একদিন চাকরানির পদে নেমে যাবে।

এ একেবারে আকাশ থেকে তারকা পতন।

স্বামী প্রভাকর বিয়ের পর থেকে কোনো কিছু গোপন করে নি বিধুরেখার কাছে। সব খুলেই বলেছে।

ডাক্তারদের মতে নিজের জীবন সংশয়ের কথাও বলেছে। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

যদি তাই হয়ে যায় কোনো সময়, বিধুরেখা যেন ক্ষমা করে তাকে। তার আত্মাকে।

মায়ের ওপর প্রভাকরের অভিমান খুব।

প্রভাকর বিয়ে করতে চায় নি।

মা জ্যোতিষীদের কথা শুনে জোর-জবরদস্তি করে দিয়েছে।

আমাকে ঠকিয়েছে মা বিধুরেখা। মা হলেও মা মায়ের কাজ করে নি। একটা মেয়ের জীবন এই ভাবে নষ্ট করে দেয়া কোনো মতেই মেনে নিতে পারে নি প্রভাকর। পারছে না। পারবে না।

স্বামী-স্ত্রী হয়েও স্বামী-স্ত্রী নয়। স্বামী-স্ত্রীর কোনো সম্পর্কই নেই।

না থাক। বিধুরেখার দুটো হাত নিজের বুকে চেপে ধরে বলেছে-প্রভাকর, এটা ঠিক, আমার ভালোবাসা নিখাদ। যদি জন্মান্তর বলে কিছু থাকে, এ জন্মে তোমাকে কাছে পেয়েও পেলুম না, পরজন্মে যেন পাই। কথা দাও।

না-হ্যাঁ—কিছু বলতে পারে নি বিধুরেখা।

শুধু দু চোখ উপচে জল ঝরেছে। আর ঝরেছে।

বাড়িতে মা-বাবার কাছে এসেও এসব কথা প্রকাশ করেনি বিধুরেখা।

হাসিমুখে বলেছে, আমার মতো সুখি কে! আমি খুব সুখি।

বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছে।

তোমরাও সুখি তো?

বাবা-মার সামনে আর বসে থাকতে পারেনি বিধুরেখা। ভেঙে পড়বে বুঝি। জল খাবার নাম করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রভাকর বিধুরেখাকে একথাও জানিয়ে দিয়েছে—মায়ের মেজাজের কোনো ঠিক-ঠিকানা আজ অবধি খুঁজে পাইনি আমি।

কখন রুষ্ট হবে, কখন তুষ্ট হবে—স্বয়ং বিধাতারও অজানা বুঝি।

মা নির্দয় যার ওপর, তার সঙ্গে হৃদয়হীনের ব্যবহার করতেও বাধে না।

আমি না থাকলে তুমি এ বাড়িতে থেক না। চরম দুর্দশা হবে তোমার। আমার আত্মা শান্তি পাবে না।

প্রভাকরের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে বিধুরেখার জীবনে।

ছেলে চলে যেতেই ছেলের জন্যে যত না কেঁদেছে শাশুড়ি, বৌ-রাক্কুসির জন্যে তত অগ্নিবর্ষণ করেছে। অপয়া, রাক্কুসি, লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগী যদি না আসত ঘরে, তাহলে এ হাল হতো না। কি ভুল করেছে শাশুড়ি! মায়াবিনীর মায়ায় পড়ে বিধবাকে সধবা করতে চেয়েছে।

তা কখনও হয়!

বিধির বিধি কি লঙ্ঘন করা যায়!

রাক্কুসির কুষ্ঠি দেখে জ্যোতিষীদের পঞ্চমুখে সুখ্যাতি। এরকম নাকি হয় না। দেবীর স্বর্গ থেকে মর্তে আগমন। এই ছেলের জন্যে এই বৌ-ই ঈশ্বরের সৃষ্টি।

বিধুরেখাকে দেখলেই শাশুড়ি সাত হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে ফেলেছে। ও কালমুখ আর দেখবে না কখনও। ভয় হয়, তাকে না স্বামী হারাতে হয় শেষে। পাপ। পাপ।

বামনি ছাড়িয়েছে। ঝি ছাড়িয়েছে। উনিশ বছরের বিধুরেখার ওপর সমস্ত ভার। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কটূক্তি। ভোর থেকে রাতের শোয়ার সময় পর্যন্ত।

তার ওপর নির্জলা একাদশী।

এক ফোঁটা জল পেটে যাবে না।

মানসিক, শারীরিক—দু দিক দিয়ে নির্যাতন।

মাঝে মাঝে বিধুরেখা যেন শোনে, শোনে রাত্তিরে, দু চোখে ঘুম নামলে —প্রভাকর বুঝি বলছে, বলে তো ছিলুম, এক মুহূর্ত আর দেরি কোর না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

বাবা দেখা করতে এলে পেটের খিদে চেপে মুখে হাসি টেনে এনে বলেছে বিধুরেখা—ভালো আছি। তোমরা ভালো থেক। আমার জন্যে ভেব না।

না, ভালো নেই।

দু মাসে দু যুগের অবস্থা হয়েছে তোর। আয়না দিয়ে মুখখানা দেখিস, ছবির সঙ্গে মেলাস!

সব কিছু সহ্য করে মুখ বুজে থেকেছে বিধুরেখা।

চলে গেলে মা-বাবার মনেই কষ্টটা বেশি হবে।

কিন্তু শেষ অব্দি আর পেরে ওঠে নি।

জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

ওষুধ নেই। পথ্য নেই। ডাক্তার নেই।

গোঁয়াল ঘরের পাশে মেঝেয় পড়ে আছে।

বাবা দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছে। একি! চোখের জল চেপে রাখতে পারে নি।

নিয়ে এসেছে বাড়িতে।

সেই আসাই শ্বশুরবাড়ি থেকে শেষ আসা বিধুরেখার।

বিধুরেখার একটা সান্ত্বনা ছিল, স্বামী বন্ধুর মতো হলেও সরল ছিল। তাকে প্রবঞ্চনা করতে চায় নি। সেই স্মৃতি মনে করেই অত কষ্ট সহ্য করেছে। মাঝে মাঝে ভেবেছে এই মায়ের এই ছেলে কেমন করে হয়! কিন্তু সত্যি সত্যি হয়। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বিধুরেখা স্বয়ং।

নীলাম্বরের বন্ধুবর এই বিয়ের ঘটকালি করেছিল।

বিধুরেখা বাপের বাড়িতে আসার পর থেকে আবার আসা-যাওয়া। মাঝে বিরতি ছিল কোন অজ্ঞাত কারণে কে জানে।

এখন নীলাঞ্জনকাকু বিধুরেখার শোকে এত বিহ্বল যে, বিধুরেখাকেই সামলাতে হচ্ছে রোজ। এসেই শুয়ে পড়ে সোফায়। হাউ হাউ করে কাঁদে। কি ভুল করেছে। কি ভুল করেছে মেয়েটার জীবন নিয়ে। ঈশ্বর তাকে শাস্তি দিক, কঠোর শাস্তি দিক—মাথা পেতে নেবে।

মা বাবার চেয়ে নীলাঞ্জন কাকুরই বেশি শোক।

সত্যিকারের মূর্চ্ছা, না ভান—বিধুরেখা মাথার ঠিক রাখতে পারে নি।

হাত পা ছোড়া, দাঁত কিড়মিড়ি—সে কি কাণ্ড!

মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যায় বিধুরেখা।

জল এনে চোখে-মুখে ছিটে দেয়। স্মেলিং সল্ট শোঁকায়। রোজ এই হাঙ্গামা।

বাপ-বেটিতে নিরঞ্জনকাকুর সেবা করেছে।

স্বর্ণশিখা এক দিনের জন্যেও নিচের বৈঠকখানা ঘরে নামে নি।

স্বর্ণশিখাকে কিছু বললে কথায় কান দেয় নি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।

নীলাম্বরকে ধরে করে রাজি করিয়েছে নীলাঞ্জন কাকু।

বিধুরেখার সিঁথিতে সিঁদুর না দেখলে সে মারা যাবে। ওর এই চেহারা সে সহ্য করতে পারছে না কিছুতেই। বিধুরেখার বিয়ে দিয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়া হোক। বঞ্চিত যেন না করা হয়।

এবারে যে ছেলে দেখেছে অতি উত্তম। খুব ভালো। সুখি হবে বিধু।

স্বর্ণশিখা নিরঞ্জনের কথায় বিশ্বাস করে নি। রাজি হয় নি মত দিতে।

আবার ওর পাল্লায়!

নীলাম্বর বলেছে, মানুষকে অবিশ্বাস করা ভালো না। নীলাঞ্জন না জেনেই এই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। এখন অনুতাপে দগ্ধে দগ্ধে মরছে। ওর কোনো দোষ নেই। কি যন্ত্রণা যে পাচ্ছে! তুমি তো নিচে নাম না, বুঝবে কেমন করে!

যাই হোক, নীলাম্বর নীলাঞ্জনের কথা মেনে নিয়েছে। নিপুণের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ে দিতে নীলাম্বর আপত্তি করে নি। রামমোহনকে শ্রদ্ধা করে, বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা করে—এঁরা সবাই বিধবা বিয়ের পক্ষে। নীলাম্বরও তাই। বিয়ে হলে তো আর বিধবাকে নির্যাতন ভোগ করতে হবে না! বিধবাদের নির্যাতন মারাত্মক। তার নিজের মেয়ের বেলায় দেখেছে। অন্য অনেক মেয়ের বেলায়ও দেখেছে। শুনেছে। অত্যাচারের সীমা-পরিসীমা নেই।

সতীদাহে আগুনে পুড়িয়ে মারা। এও জ্যান্ত—নির্যাতনের আগুনে প্রতিদিন পুড়িয়ে মারা। একই পোড়ান—তফাৎ ব্যবহারের।

সতীদাহ, বিধবার যন্ত্রণা—এসব একদমই পছন্দ করে না স্বর্ণশিখা। কিন্তু স্বর্ণশিখা নীলাম্বরকে এত ভালোবাসে যে নীলাম্বরের সঙ্গে তারও যেন মৃত্যু হয়।

একি সম্ভব?

কেন?

অনেক দিন আগের কথা।

এখনও মনে পড়ে স্বর্ণশিখার। বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর কড়েয়ার সুনীল ঘোষ মারা যায় নি কি, স্ত্রীর সঙ্গে—এক সঙ্গে?

সে তো ইলেকট্রিক শকের ব্যাপার। স্ত্রীকে ছাড়াতে গিয়ে স্বামী গেছে।

স্বর্ণশিখা হারবার পাত্রী নয়। যুক্তিপ্রমাণ হাতে না নিয়ে সে কোনো কথায়, কাজে

এগোয় না।

কেন! নিমতলা ঘাটের আরও আগে শ্মশানেশ্বর ঘাটের কথা কি মনে নেই! শ্মশানেশ্বর শিব মন্দিরের লাগোয়া এক স্টুডিওয় সাজান ফোটোর কথা!

স্বামী-স্ত্রীর কি সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি!

কি সুন্দর মৃত্যু!

স্বামীর খাটের পাশে স্ত্রীর খাট। এলোচুলে সিঁদুর ঢালা।

ছেলেরা খাটের চারপাশে বসে আছে।

স্বামীর মৃত্যুর কথা শোনা মাত্র স্ত্রীর বুকের ভেতর আনচান করে উঠল। আর সেই মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

নীলাম্বর বলেছে, ভাগ্যং ভাগ্যং ফলং দেহি। ভাগ্যে থাকলে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

নিপুণ দেখতে সুপুরুষ।

চাউনিতে একটা মোহ আছে।

দেখলে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

কেমন যেন উদাস, আনমনা।

কাছে আছে অথচ দূরের কি ভাবছে।

নীলাঞ্জনকে জিগ্যেস করেছে নীলাম্বর, বলি, মেয়ের দিকে মন থাকবে ওর! নাকি অন্য দিকে মন আছে! ওর চাউনিটা দেখিস।

আহা! তা আর হবে না! ছোটবেলায় মা মারা গেছে। বিধুকে দেখে অব্দি মায়ের কথা মনে পড়ছে। বিধুর ঠোঁট আর ভুরু অবিকল ওর মায়ের মতো। ছেলে ভালো নিয়ে কথা। তুই তো আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছিস না। তোর তো ছেলে নেই, ও তোর ছেলে হয়েই এ বাড়িতে থাকুক না।

নীলাম্বরের মন মেনে নিয়েছে। নীলাঞ্জনের কথাটা মন্দ নয়।

ছেলেটিকে দেখার পর থেকে নীলাম্বরের ভেতরেও একটা মমতা জন্মেছে।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে নতুন করে চার হাত দু হাত হয়েছে।

প্রণয় বন্ধন—নিপুণ আর বিধুরেখার।

মেয়েটা বড় একা। একেবারে সঙ্গীহীন। তারা চলে গেলে দেখবে কে! তবু একটা সৎসঙ্গী পাবে তো!

হ্যাঁ, সৎসঙ্গীই বটে।

জন্তু-জানোয়ারকে তবু চেনা যায়। কখন রাগী কখন খুশি।

কিন্তু মানুষকে চেনা দায়।

কখন যে কি রূপ ধরে কেউ বলতে পারে না। আজ যে ভালো, কাল সে বিশ্বের সেরা মন্দ। আজ যে মন্দ কাল সে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব।

মানুষ চরিত্র অতি বিচিত্র।

প্রায় বছর খানেক বিধুরেখা প্রকৃত সৎমানুষের সঙ্গেই বসবাস করেছে। সৎসঙ্গই পেয়েছে। যতক্ষণ না তার কোলে মনোশোভা এসেছে।

তারপর এক এক করে তুরুপের তাস পড়েছে। নিপুণের কৌশলী খেলা।

তখন বিকেল পাঁচটা।

পৌষের সন্ধে।

শীতের আমেজ রয়েছে।

হঠাৎ বাড়ির গেটের সামনে ভারি গলার চেঁচামেচি। আকাশ ফাটান চিৎকার। বারান্দায় বেরিয়ে দেখে সর্বনেশে কাণ্ড। মান ইজ্জত যাওয়ার যোগাড়। এযে পাড়া প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখান দায় হয়ে দাঁড়াবে। দুপাশে দুজন লম্বা-চওড়া কাবলিঅলা। দু দিকের দু হাত ধরে টানাটানি করছে। মাঝে মাঝে চড় তুলছে গালের কাছে। ঘুষি পাকিয়ে দাঁতের কাছে হাতের মুঠো।

ব্যাপারখানা কি?

জানা গেল এদের কাছে টাকা ধার নিয়েছে নিপুণ।

না দেয় সুদ, না দেয় আসল।

এ আসামীকে ওরা খুঁজে খুঁজে ধরতে পারে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

নসিব ভালো, ধরা পড়েছে আজ। টাকা না নিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না ওকে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দেবে।

আলমারি খুলে সমস্ত জমান টাকা বার করেছে বিধুরেখা। থাক মান, যাক প্রাণ।

হয়ত বিধুরেখার পেছনেই খরচ করেছে ধার নিয়ে। এক আধ টাকা নয়, একেবারে পাঁচ। মানে পাঁচ হাজার। যাই হোক, কাবলিঅলাদের হাত থেকে মুক্ত করেছে নিপুণকে বিধুরেখা।

স্বর্ণশিখার মুখ ভার। নীলাম্বরের মুখ ভার।

স্বর্ণশিখা কপাল চাপড়ে ঘরে ঢুকে পরদা টেনে দিয়েছে।

একেই বলে ভাগ্য।

ভাগ্য নয়। দুর্ভাগ্যই।

ভালো জামাইয়ের এই নমুনা!

কে জানে আরও কত কি দেখতে হবে, কত কি শুনতে হবে পরে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে নীলাম্বর।

আবার ভুল।

মেয়েটা বাঁচলে হয়।

পায়ে পায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেছে নীলাম্বর।

চেয়ারে বসে আছে নিপুণ। ঘামেতে চান।

শীতেতেও এত ঘাম কেন?

বিধুরেখার মোছাতে ইচ্ছে করেনি।

গম্ভীর গলায় বলেছে, তোমার জন্যে বাবা-মার ইজ্জত-মান গেছে। এরকম ঘটনা যেন আর না ঘটে। জোড় হাত করে মাথা নেড়েছে শুধু নিপুণ। আর হবে না। কখ্‌খনও না। ক্ষমা। ক্ষমা ক্ষমা।

মাস দুয়েক আবার বেশ চুপচাপ। ভালো মানুষ। তারপর আবার হাঙ্গামা।

এবারে রাস্তায় নয়, বাড়ির ভেতরে এসে হামলা। একসঙ্গে পাঁচ-ছ জন। অফিসের বেয়ারা দারোয়ান। সেই এই ব্যাপার। টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয় নি। না দিয়েছে সুদ। না দিয়েছে আসল। এবারেও বিধুরেখার মান বজায় রাখার জন্যে টাকা শোধ করতে হয়েছে নিজেকে।

এরপরের ঘটনা খুবই মর্মপীড়ার।

শতচ্ছিন্ন শাড়ি পরনে হাতে লাল সুতো বাঁধা। বাঁ হাতে একটা লোহা।

অনেক দিন ধরে পেটে কিছু না থাকলে চেহারার দৈন্যদশা যেমন হয়, ঠিক তেমনই।

সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে—বছর চারেকের।

তরুণীর রুখু চুল। কত দিন যে মাথায় তেল পড়ে নি, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মুখ ফ্যাকাশে। রক্তশূন্য।

জ্যোতিষী না হয়ে, যোগিনী না হয়েও এই তরুণীর ভবিষ্যৎ দেখতে কোনো অসুবিধেই হয়নি বিধুরেখার।

দুরবস্থা দেখে চোখের জল চেপে রাখতে পারেনি।

ও কেঁদে কিছু বলতে চেয়েছে। গলা ভেঙেছে। হাঁপাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। কিন্তু চোখের জল ঝরে নি।

বেচারি! চোখ দুটোও শুকিয়ে গেছে বুঝি।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যা বলেছে, তার সারমর্ম বুঝতে বাকি নেই বিধুরেখার।

তরুণী নিপুণের প্রথম স্ত্রী—বরুণা।

বরুণাকে লুকিয়ে নিপুণ আর একটা বিয়ে করেছে।

সে পালিয়েছে, কি পরপারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে জানা নেই বরুণার।

ছেলের জ্বালায় মা বেঁচে থেকেও মরে রয়েছে।

প্রবঞ্চক ছেলের জন্যে মায়ের দিনরাত মৃত্যু কামনা।

নিপুণ ছোটবেলা থেকেই কুসঙ্গের পাণ্ডা।

কোনো নেশাই ওর বাকি নেই।

হ্যানো কোনো কুকর্ম যে না করেছে, তা নয়।

বরুণা তো মরছেই। ক'দিন বা আছে পৃথিবীতে।!

সাবধান করে দিতে এসেছে বিধুরেখাকে। বিশ্বাসঘাতককে যেন কোনো দিন বিশ্বাস না করে। বিধুরেখা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুক।

বিধুরেখা আলমারি থেকে নিজের ভালো একখানা শাড়ি বার করে পরিয়ে দিয়েছে বরুণাকে। বরুণার হাতের মুঠোয় কিছু টাকা জোর করে গুঁজে দিয়েছে।—বাচ্চা খাবে।

যাওয়ার সময় বরুণা বলে গেছে, নিপুণ কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ মনের মানুষ নয়।

মানসিক রোগীর হাসপাতালে ওকে থাকতে হয়েছে মাঝে মাঝে।

জোছনায় কালো মেঘ এসে হাজির হয়েছে বিধুরেখার জীবনে।

প্রভাকর ছিল দেবতা। নিপুণ তো নরপশু।

এরপর যতটা পেরেছে নিজেকে নিপুণের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে বিধুরেখা। মনের কথা বাবা-মাকে জানায় নি কষ্ট পাবে বলে।

ধুরন্ধর নিপুণ লক্ষ করেছে বিধুরেখাকে। কথাবার্তায়, মেলামেশায়, সেবা-শুশ্রূষায় আগের বিধুরেখাকে কিছুতেই ফিরে পাচ্ছে না।

একদিন বলেছে, সংসার আর ভালো লাগে না। সকলের কাছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। ধার করে নিজের জন্যে নয়, গরিবদের দেখলে মন কেঁদে ওঠে তাই।

মা মরে যাওয়ার সময় সাহায্য করতে আদেশ করে গেছে।

ফুলদানি রাখা টেবিলটি ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছে বিধুরেখা।

উফ! কি মিথ্যুক!

কথাটা ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আটকে পড়েছে।

বিধুরেখার হাত ধরে কেঁদে বলেছে নিপুণ—তোমার এ অধম স্বামীকে মন থেকে মুছে ফেল। কোনো কর্তব্যই করে যেতে পারলাম না তোমার আর মনোশোভার জন্যে। তোমরা আর আকর্ষণ কোরো না আমায়। যেখানে যাচ্ছি, যেন সিদ্ধিলাভ

করি।

পরদিন থেকে নিপুণ অদৃশ্য।

প্রায় তিন মাস পরে আবার ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছে বিধুরেখার সামনে।

বিধুরেখা অবাক।

নীলাম্বর, স্বর্ণশিখা, বিধুরেখা-নিপুণের ব্যাপারে মাথা গলায় নি।

ওরা তিতিবিরক্ত।

নিপুণের ন্যাড়া মাথা। মস্ত বড় টিকি। কপালে তিলক। গলায় তুলসিমালা। পরনে কৌপিন। সর্বাঙ্গে ছাই মাখা। সঙ্গে ওরই মতো কৌপিন পরা আর এক জন দীর্ঘদেহী।

সে খনখনে গলার আওয়াজে বলেছে, গুরুজি নে ভেজ দিয়া। আভি পরিবার কো সাথ রহনে হোগা। আভি পরিবার কো সাথ দশ সাল রহনে পড়েগা।

আঃ! আবার আপদ।

আবার গুণগার দিতে হয়েছে।

সঙ্গের সাধুটির আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া। তিন মাস থাকার খরচ।

এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই বিধুরেখার? নিস্তার নেই কোনো?

কাকে আর বলবে। নিজের মনের কাছেই নিজের মনের কথা বলে আর জানতে চায় পথের হদিশ।

নিপুণ মানুষটাকে বহুরূপী বললেও কম করে বলা হয়।

যতটুকু বুঝেছে বিধুরেখা, এই মানুষ প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে। আবার প্রাণ দিয়েও অন্যের প্রাণ মুঠোয় পুরে ফেলতে পারে মুহূর্তের মধ্যে।

এর দুনিয়ায় অসাধ্য বলে কিছু নেই।

ভালো ভাবে লক্ষ্য করেছে মুহূর্তের মধ্যে মানুষটার চোখ-মুখ সব বদলে যায়। এমনকি গলার আওয়াজ সুদ্ধ। আশ্চর্য!

রাগলে জ্ঞান থাকে না।

ঘরের কাঁচের জিনিসপত্র একটাও আস্ত পাওয়া যায় না।

চূর্ণ-বিচূর্ণ।

আর সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরে বসে হা-হা করে কি হাসি!

বুক কেঁপে ওঠে।

স্বাভাবিক নয়। একেবারে উন্মাদ।

হিমালয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী-সঙ্গ করে কি সৎ হয়ে ফিরেছে, বুঝে উঠতে পারে না বিধুরেখা।

সময় সময় মনে হয় মাথাটা বুঝি তারও খারাপ হয়ে গেছে।

বাচ্চা মেয়ে মনোশোভার মনে বাপের কীর্তি-কলাপে কি দাগ কাটছে কে জানে!

মেয়েটা ওর মতো না হলে বাঁচি।

ইদানীং অত্যাচারের বাড়াবাড়ি চলছে। চরম।

রোজ নেশার টাকা যোগাতে হবে। তা না হলেই গায়ে হাত। গয়না-গাঁটিতে হাত।

বিধুরেখার ভয় ধরেছে।

ওর সঙ্গে একলা থাকতে ভীষণ ভয়।

নীলাঞ্জনকাকু এখন আর বাড়িতে বেশি আসে না। হয়ত আসবার প্রয়োজন বোধ করে না। নিপুণের আচার-ব্যবহারের কথা শুনে নিজের মাথা চাপড়ায়। গালে চড় মারে। বুকে ঘুষি মারে।

আবার দুর্ভোগ!

তার তো জানা ছিল না এসব। ভালো ছেলেই জেনেছে।

ওকে কিছু বলবার উপায় নেই। শোনাবারও জো নেই।

শুনলেই বিপদ। জ্বালার ওপর জ্বালা আরও বাড়ে বিধুরেখার।

ওপরে চোখ তুলে কাকুর ফিট। বিধুরেখার দৌড়ঝাঁপ। চোখে-মুখে জল দেয়াদেয়ি। সেবা করা করি। হাত ছুঁড়ছে। পা ছুঁড়ছে। হাত ধরে টানা। পা ধরে টানা। ভালো কপাল তার। যদি পড়তে পারত বিধাতার লিখন, তাহলে কপালের ছালটা তুলে দেখে নিত আরও কি বাকি আছে।

বাকি আছে মর্মান্তিক দৃশ্য।

নির্দয় ঘটনা।

হয়ত নিয়তি তার নিজের ভাষায় বলেছে, যেটা তখন শুনতে পায় নি বুঝতে পারে নি বিধুরেখা।

সেদিন বিকেলবেলায় অর্গানটাকে মুছতে মুছতে একটা গান গাইতে ইচ্ছে হয়েছে। ঢাকনাটা খুলে মোড়ায় বসে পড়েছে।

পায়ে বেলো চলছে।

রিডের পরদায় আঙুল ওঠানামা করছে।

পুরনো দিনের গান। ইন্দুবালার প্রথম দিককার সাড়া জাগান রেকর্ডের গান। ইমন রাগে।

*তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে*
*এস হে এস হে*
*আমার দলিত হিয়ায় পরতে পরতে*
*তুমি ব'স হে ব'স হে*

*ব'স হে ব'স হে*

*পাতিয়াছি হেথায় রতন আসন*

*রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন,*

*কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন, নয়নের কোণে তুমি*

*একবার চাহ হে, একবার চাহ হে।*

*পিক-মুখরিত অলি-গুঞ্জরিত মন্দ-মলয় সমীর-সিঞ্চিত*

*হে প্রিয়সুহৃদ, হে চিরবাঞ্ছিত বারেকের তরে তুমি হাস হে*

*তুমি হাস হে, হাস হে।*

মনোশোভা মায়ের পা জড়িয়ে ধরে গান শুনছে এক মনে।

আচমকা একটা আওয়াজ।

চমকে উঠেছে বিধুরেখা।

এমন ভাবে পরদা টেনে সরাল নিপুণ. ভেতরের রডটাসুদ্ধু খুলে পড়ে গেল মেঝেয়।

নিপুণের কথা এলিয়ে যাচ্ছে। নেশায় টলছে।

বুকের ভেতর কেঁপে উঠেছে বিধুরেখার।

এসেই চুলের মুঠি ধরেছে—শিগগির টাকা বার কর। আবার খেতে যাব। খাওয়াটা পুরো হয়নি। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

বেশ মজায় আছিস মাইরি। আমি ভেবে মরি তোদের জন্যে আর তুই অন্যের জন্যে ভাবছিস।

বিকৃত গলায় মুখ ভেঙচে গেয়েছে—

*তুমি এস হে এস হে...*

কাকে ডাকছিলিস শুনি! ঢঙি। তিন মাস ছিলুম না। এর মধ্যে কোন নাগর বানিয়েছিস.! বল আমায়। কাউকে বলব না। মেয়েটাকেও তৈরি করছিস দেখছি।

জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে বলেছে বিধুরেখা। টাকা দিচ্ছি। তুমি এরকম চিৎকার কোরো না। লোকে কি বলবে!

ও, ভয় হচ্ছে! কুলের কথা তোর বলে দেব বলেছি বলে!

দ্যাখ নিপুণ, ভদ্র বাড়ি ভদ্র পাড়া সাবধানে কথাবার্তা বল। মেয়েটা তোমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে। ওর মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভেবে দেখেছ! এরপর বাপ বলে ও কোনো দিন শ্রদ্ধা করতে পারবে তোমাকে!

মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে বুঝি মেয়েটার কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না!

বাজে কথা ছাড়—হাতে তুসকি দিতে দিতে বলেছে—টাকা দে। টাকা দে।

শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে বিধুরেখা। আপদকে বিদেয় করার জন্যে।

গদির তলা, তোশকের তলা, বালিশের নিচে—খুঁজতে আর বাকি রাখছে না। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না।

পেছন থেকে হা-হা-হি-হি করে হেসে উঠেছে নিপুণ। পৈশাচিক হাসি।

নে নে—তোকে আর খুঁজতে হবে না। এই তোব চাবি।

অবাক চোখে তাকিয়েছে বিধুরেখা।

আলমারির চাবি, বাক্সের চাবি ওর কাছে গেল কি করে!

টাকা নিয়ে বিধুরেখার মাথায় হাত দিয়ে দুবার থাবড়ে দিয়েছে নিপুণ। বলেছে, তুই বড় ভালো মেয়ে। যখুনি টাকা চাইব, এই ভাবে আমায় লক্ষ্মী মেয়ের মতো দিয়ে দিবি। তোর কূলের কথা একদম বেরবে না। বুঝলি!

দাঁত বার করে হা-হা হি-হি করে হেসে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

বিধুরেখার যন্ত্রণা ভোগের এইটাই কি শেষ।এইটাই কি চরম-মোক্ষম!

না না।

এটা নয়, এটা নয়।

আছে। আছে। আরও আছে।

একি!

কে!

কে বললে একথা!

কই, কেউ তো ঘরে নেই।

সত্যি সত্যি কি পাগল হয়ে গেল বিধুরেখা?

না, না পাগল হবে কেন? এত শিগগির নয়।

কে বলছে এসব?

বিধুরেখা শুনছে। একি তার মনই বলছে সব?

একি তার ভেতর বলছে? মনের কানে মনের কথা শুনছে?

আনমনা হয়েই অর্গানের সামনে এসে আবার বসেছে বিধুরেখা।

নিজের অগোচরেই বাজিয়ে চলেছে।

*"ভুলিয়ে দাও সকল ব্যথা*
*দুলিয়ে দাও আনন্দেরই দোলা...*

আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠোটের ফাঁকে জোর করে হাসি টেনে এনেছে।

ঠিক হয়েছে।

এ মুখ দেখলে এ হাসি দেখলে কারও সাধ্য নেই কিছু বুঝতে পারে।

ভেতরে যে দস্যি-দানার উৎপাত হয়ে গেছে একটা কিছুক্ষণ আগে, এটা কেউ ধরতেও পারবে না।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি মনোশোভাকে।

ঘর থেকে বেরবার আগে হঠাৎ চেয়ে দেখে খাটের পায়াটা ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনোশোভা। দু চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে।

বিধুরেখা তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়েছে মেয়েকে।

পিঠে হাত বুলোচ্ছে।

আয়নায় দেখলে হয়ত দেখতে পেত মা-মেয়ের মুখের হাসি।

একদিকে মেয়ের গাল বেয়ে টস টস করে চোখের জল পড়ে মায়ের পিঠ ভিজোচ্ছে। আর এক দিকে মায়ের চোখের জলে মেয়ের জামার পিঠ ভিজছে।

মেঝেয় জাজিম পাতা।

ওস্তাদজি এলে মেঝেতেই রেওয়াজের আসর এই ভাবেই বসে।

আগেকার বিখ্যাত পেয়ারে কাওয়াল।

পেয়ারের গলা কোকিলকণ্ঠ বললেই হয়।

পরদার আড়ালে গাইলে কার সাধ্যি ধরে কোনো পুরুষ গাইছে।

এই গুণী গায়কের ছাত্র ফকিরদিন।

বিধুরেখার সঙ্গীত শিক্ষক।

তবলা বাজাচ্ছে বশির আলি।

সঙ্গে মিশ্রজির সারেঙ্গি।

দোতলায় যখন গানের আসর বসে, বিধুরেখা যখন গায়, রাস্তায় লোক জমে যায়।

কি দোলা। কি গান!

শুনে শুনেও আশ মেটে না।

মনে হয় রাত ভ'র শোনে।

পাশ দিয়ে কে যেন একটা মাতাল বলতে বলতে গেছে—রাত ভ'র শোনাচ্ছি।

ঐ তো বাড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল।

তর তর করে ওপরে উঠে এসেছে নিপুণ। চিৎকার। কটূক্তি। ওস্তাদকে, তবলচি, সারেঙ্গী বাজিয়েদের গালাগালি। বিধুরেখাকে গালাগালি।

রাগে কাঁপছে বিধুরেখা।

কাঁপা গলায় বলেছে, এক পয়সা পাবে না। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

বেরব বই কি! তোমাদের সুখবিলাসের আসর ভেঙে দিয়ে বেরব।

সারেঙ্গি কেড়ে নিয়ে আছড়ে ফেলেছে কার্পেটের ওপর।

হারমোনিয়ামে লাথি। তবলায় লাথি।

ঘরের মধ্যে মারামারি ঘুষোঘুষি চিৎকার।

স্বর্ণশিখার বারণ সত্ত্বেও পাশের ঘর থেকে নীলাম্বর ছুটে এসেছে।

নীলাম্বরের বুকে দুই ঘুষি মেরে নিপুণ চিৎকার করে উঠেছে—দালাল।

বাপের হেনস্থা দেখে এগিয়ে এসেছে বিধুরেখা।—তোমার এত বড় সাহস!

দেখাচ্ছি তোকে। সজোরে বিধুরেখার মাথা চেপে ধরেছে দু হাতে।

দড়াম দড়াম করে ঠুকে দিয়েছে দেয়ালে।

রক্তারক্তি।

বিধুরেখা বেহুঁশ।

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে স্বর্ণশিখা।

চিৎকার করে ডেকেছে—বিক্রম সিং! মাতাল কো পাকড়কে লে যাও থানে মে। কভি কোঠি মে ঘুসনে মত দেও!



নীলাম্বরের চোখে জল আসছে না কিছুতেই।

কথা কইতে কষ্ট। কান্নায় ভরে গেছে কণ্ঠ।

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেছে, তারপর থেকেই বিধুরেখার এই অবস্থা। কেমন যেন হয়ে গেছে। ও আর ও-তে নেই।

মানুষজন চিনতে পারে না। জোর করে খাইয়ে না দিলে খেতেও চায় না। খায় না। শুইয়ে না দিলে শোয় না।

সনচরির দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর বলেছে, তোর মাকে দেখেই যেন ও নতুন জীবন পেয়েছে।

সনচরি তোয়ালে করে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে নীলাম্বরের। ওর দুচোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। তবুও আস্তে আস্তে বলছে, দাদু চুপ কর। দাদু চুপ কর। তোমার বুকের ব্যথা বাড়বে।

মেয়ের হাল-অবস্থা দেখে কলকাতায় থাকতে চায়নি একদিনও স্বর্ণশিখা। মধুবনিতে দু-এক ঘর জ্ঞাতি আছে। ওরাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে গ্রামের শেষে এই বাড়ির।

গেট দিয়ে ঢুকতেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা বেশ বড় হয়েছে।

স্বর্ণশিখাই পুঁতেছে।

চাপা মনের মানুষ স্বর্ণশিখা। কাউকে কিছুই বলে নি। চুপচাপ থেকেছে। মেয়ের আঘাতটা বোধহয় সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছে তার কাছে। ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

এই বাড়ির বাতাসেই তার শেষ নিশ্বাস মিশে আছে।

দু চোখে হাত চাপা দিয়ে বেশ জোরেই কেঁদে উঠেছে নীলাম্বর।

সনচরি বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

তীরথ-মা কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বোঝাচ্ছে—নীলাম্বরদা, তুমি জ্ঞানী। আত্মার মৃত্যু নেই। জানই তো। কেন

ভাববে নেই! আছে। স্বর্ণশিখাদি আছে। বিধুরেখা নিশ্চয়ই আবার তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পাবে।

চিৎকার করে বলে উঠেছে নীলাম্বর, না, তীরথ-মা। আমি চাইনা ও পূর্বস্মৃতি ফিরে পাক। সে স্মৃতি বড় দুঃখের। বড় যন্ত্রণার। থাকুক, ও ভুলে থাকুক। গান ওর ফিরে এসেছে। গানেতেই যেন ডুবে থাকে।

জলভরা চোখে সনচরির মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, তোদের ঋণ আমি কোনো দিন শোধ করতে পারব না রে। যা বড় বড় ডাক্তাব, কবিরাজরা করতে পারে নি, তা করেছে তোর মা আঁখিয়া।

প্রথম যখন এখানে আসে—সেটাও একটা মেলার দিন। যতটুকু মনে পড়ে সে বছরে কম বৃষ্টি। ধান রোয়া ভালো ভাবে হয়নি।

বৃষ্টির জন্যে ইন্দ্রপুজো শুরু হয়েছে। মেলা চলছে।

তোর মায়েরা এসেছে মেলাতে খেলা দেখাতে। দড়ির খেলা। দড়ির ওপর দিয়ে এপারে-ওপারে যাওয়া-আসা। এসেছে রাজস্থানী গান শোনাতে।

মেলাতে আঁখিয়ার গান শুনে ভালো লেগেছে। তাই বাড়িতে ডেকে এনেছে নীলাম্বর। যে গানটা গেয়েছে মেলায়, সেই গানটা আবার গাইতে বলেছে।

আঁখিয়া কানে হাত দিয়ে গান ধরেছে। তিন তারের বাজনা বাজাচ্ছে সনচরির বাবা—শুকদেও।

ঢোল বাজাচ্ছে সনচরির কাকা—রূপলাল।

গলা ছেড়ে গাইছে আঁখিয়া—

*নাথ ক্যায়সে গজবন্দ কো ছুড়ায়ো*
*গজ অর গ্রাহ চলে জল ভিতর*
*লড়তে লড়তে গজ আয়ো*
*জল ভরি শুণ্ডা করিয়া উপর*
*তব হরি নাম কামায়ো*

প্রভু, কচ্ছপ এই যে শুঁড় ধরে তাকে জলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এই বিপদ থেকে তুমি হাতিকে মুক্ত কর।

গানটা শুনতে শুনতে বিধুরেখা যেন আগের দিনের গানের জগতে ফিরে এল ধীরে ধীরে।

আশ্চর্য ঘটনা।

ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা বলে যদি কেউ থাকে, তাকে ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ।

আস্তে আস্তে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে বিধুরেখা।

আঁখিয়ার কাছে আসতে আঁখিয়াও দাঁড়িয়ে পড়েছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরেছে বিধুরেখা। বলেছে, এত সুন্দর গান। তুমি আমাকে শেখাও।

নীলাম্বর বলেছে আঁখিয়াকে, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াও তোমরা, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এ বাড়িঘর তোমাদের। এখানে তোমাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি ভেবে থাকতে হবে। আমি ছাড়ব না। তোমরা আমার মেয়ের জীবন। মেয়ের মহৌষধ।

তখন সনচরির বয়েস ছয়।

সনচরিও নীলাম্বরের জীবন বাঁচিয়েছে।

লোকে বলবে ছ বছরের মেয়ে আবার কেমন করে বাঁচাল! পরমায়ু ছিল বেঁচে গেছে।

না, না। কথার মারপ্যাঁচে এড়িয়ে গেলে চলবে না। যা সত্যি, তা চিরকাল সত্যি। স্বীকার করতেই হবে। তা না হলে নীলাম্বর শান্তি পাবে না। অকৃতজ্ঞতার সাজা পাবে।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে সময় নীলাম্বর।

একটা পাগলা মোষ ক্ষেপে দৌড়ে এই দিকেই তেড়ে আসছে।

সরতে সরতে একেবারে কাছাকাছি।

লাল চোখ। মুখে ফেনা। ফোঁস ফোঁস করছে আর মাথা দোলাচ্ছে।

হাত দুই-তিনের তফাৎ।

নীল ঘাগরা চোলি পরা সনচরি ছোট ছোট ফর্সা হাত দুটো ওপর দিকে তুলে মিষ্টি সরু গলায় আধো আধো কথায় মোষটার সামনে গিয়ে বলেছে, রুখ যাও। রুখ যাও। রুখ যাও।

তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে।

মোষটা শুয়ে পড়েছে। ল্যাজ নাড়ছে। চোখের কোণে জল।

সনচরি পিঠে উঠে বসে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। শিঙ দুটো ধরে নাড়ছে।

সবাই হতভম্ব-হতবাক। তীরথ-মা পর্যন্ত। কোথাকার শক্তি, কি শক্তি!

সেই ছ বছরের সনচরি আজ আঠার।

এখনও কি সেই শক্তি আছে?

সনচরি নিজেকেই নিজে জিগ্যেস করছে।

সনচরির মুখের ভাব ক্রমে ক্রমে পাল্টে যাচ্ছে।

নীলাম্বর দাদু তাকে নিয়ে এসে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে দড়ির খেলা আর কোনো দিন দেখাবে না।

কোথায় তার শক্তি?

সে কি কারও কিছু করে আসতে পেরেছে? যারা দড়ি কেটে দিয়েছিল তাদের?

সুদমের বুকে পড়ে যাওয়ার জন্যে কান পাতা যায় না, অকথা কুকথা যারা বলেছে, তার চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়েছে, তাদের কি করতে পেরেছে সে?

খেলার মাঠ থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসা মানেই তো কলঙ্কের বোঝা মাথায় পেতে নেয়া।

জয় তো দুর্জনদেরই হয়েছে।

পরাজয়। পরাজয়। মস্ত বড় পরাজয় সনচরির।

এসব কথা কাকে বলবে সে? কে শুনবে?

কই, কোনো শক্তির খেলা তো সনচরি দেখাতে পারে নি সেখানে।

সনচরির সামনা সামনি বসে আছে তীরথ-মা।

দৃষ্টি সনচরির ওপর।

সনচরি তীরথ-মা-র অতি স্নেহের অতি আদরের।

সনচরির ভেতরে যে প্রবল ঝড়ের দাপাদাপি চলছে, তীরথ-মা বুঝতে পারছে।

সনচরিকে জিগ্যেস করতে যাচ্ছে, তুই এমন কেন? মুখে হাসি নেই কেন?

জিগ্যেস করতে আর হয় নি।

রাগে ক্ষোভে উত্তেজনায় সনচরি ফেটে পড়েছে নিজে থেকে।

কাঁদ কাঁদ গলায় তীরথ-মাকে বলেছে, তুমি খালি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েই গেছ এত কাল। এত শক্তি, অত শক্তি, তত শক্তি।

মাঠসুদ্ধ লোক আমাকে বলতে আর কিছু বাকি রাখে নি। তুমি কি বল, প্রতিবাদও আমি করব না! মুখ বুজে মাথা পেতে সব সহ্য করে নিতে হবে?

মাইয়া, আমি বলে দিচ্ছি, এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

দড়ির খেলা খেলি না খেলি মাঠে আমি যাবই। আমি দেখতে চাই কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে।

সনচরির সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, রাগে।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে।

বেরিয়ে যাচ্ছে।

তীরথ-মা দৌড়ে এসে ওকে বুকে চেপে ধরেছে।

তীরথ-মা-র বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছে সনচরি।

তীরথ-মা-রও চোখে জল।

কান্না ভেজা গলায় বলে চলেছে, ভাবতে পারিনি আমি কোনো দিন তোর এ মূর্তিও আমায় দেখতে হবে। এর আগে আমার মরণ হওয়াই ছিল ভালো।

তীরথ-মা-র মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছে সনচরি, না। না। না। ওকথা আর বোল না।

কেন, বলব না কেন? যাকে দেখেছিলুম শুভশক্তিতে ভরপুব, সকলের মঙ্গল, সকলের নয়—জগতের মঙ্গলঘট একটা। শেষ অবধি এ কি দশা! আমার ইচ্ছে, আমার চেষ্টা, আমার সাধনা—আজ সব ব্যর্থ! আমার শিক্ষা-দীক্ষা কি সবই ভুল! আমি কি কিছু ওকে দিতে পারি নি! বোঝাতে পারিনি!

চুপ হয়ে গেছে তীরথ-মা।

খালি কান্না আর কান্না।

কান্না ভেজা গলায় আবার বলেছে, বিশ বার বলেছি, সহ্য ক্ষমতাটাকে বাড়াও। প্রতিশোধ নিতে যাস নি। রাগ করিস নি কোনো দিন।

এসব গেছে কোথা তোর! সেই রাগ, সেই প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছে। আমার ভালোবাসায় কি তাহলে কেবল খাদই ছিল! এতটুকু কি আসল ছিল না! তুই বল আমাকে।

সনচরি তীরথ-মা-কে আরও আঁকড়ে ধরেছে।

না। না। তোমার কিছু ব্যর্থ যায় নি। যাবে না। তোমার কোনো কিছুতে কোনো খাদ নেই। আমার নেয়ার ক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে দাও। খাদ যদি কিছু থেকে থাকে, সে আমার মধ্যেই আছে।

থাকলে তোর জন্যে এত পাগল হয়ে বেড়াতুম না। ধরমিয়ার ঈর্ষার কারণ হতুম না।

তুই তো নিজের কানে শুনেছিস, আমি একচোখো—আমি ধরমিয়াকে দেখতে পারি না। ধরমিয়া পাছে বড় হয়ে যায় সবার চেয়ে, তাই কিছু শেখাই না। তোর সব ব্যাপারে আমি অন্ধ। ধরমিয়া অভিশাপও দিয়েছিল, তাকে বঞ্চিত করার জন্যে তীরথ-মা অন্ধ হবে।

এখনও আমি বলছি সনচরি, নিজেকে চিনতে শেখ। নিজেকে বুঝতে শেখ। ভালো-মন্দ বিচার করতে শেখ। আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বল তো আমাকে, তুই কি কোনো দিন রাগ ত্যাগ করতে পারবি?

না। না।

তা-লে আমাকে ছেড়েছুড়ে দে। আমারও মুক্তি হোক। তোরও মুক্তি হোক।

মাইয়া, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার অন্যায়ের জন্য।

আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে কি লাভ? তুমি তোমার নিজের কাছে ক্ষমা চাও। তোমার রাগের কাছে ক্ষমা চাও। আর যেন রাগ না আসে কখনও। তোমার বিবেকের কাছে ক্ষমা চাও। বিবেক যেন তোমাকে সদা-সর্বদা উচিত বিচারের পথে নিয়ে যায়।

নিজের শাড়ির আঁচলে সনচরির দু চোখ মুছিয়ে দিয়েছে তীরথ-মা। বলেছে, অনেক বকেছি। অনেক বলেছি। তুই যে সাধারণ নয়, তাইতেই বড় দুঃখ পেয়েছি। তোর এ মনোভাব আসবে কেন? আমি দেখতে চেয়েছি একদিন লোকে তোকে বুঝবে। তুই বড়। অনেক বড়।

তীরথ মা-র ডান হাতখানা টেনে নিয়ে সনচরি নিজের মাথায় রেখেছে। বলেছে, আশীর্বাদ কর।

তোকে প্রথম দেখেছিলুম খ্যাপা মোষের সামনে দাঁড়াতে। তখনই বুঝেছি, তুই ঠিক সাধারণ মেয়ের মতো নয়।

তারপর দেখেছি তোকে তুই যখন বছর দশেকের।

ঘরেতে পড়ে রয়েছি একা। জ্বরে বেঁহুশ।

ঘরে ঢুকে ঐ অবস্থা দেখে মাথায় হাত বুলিয়েছিস। আর এক মনে ভেবেছিস জ্বরটা ছেড়ে যাক। তোর ভাবাটাই অনেক কাজ দিয়েছে।

দরদর করে ঘাম। সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে। একটা প্রশান্তি এসে গেছে শরীরে। চোখ মেলে চেয়ে দেখেছি। তোকে নয়। কি দেখেছি জানিস? লক্ষ্মী। লক্ষ্মী। নারায়ণের স্ত্রী—স্বয়ং মা লক্ষ্মী আমার কপালে হাত রেখে বসে আছে মুখের দিকে তাকিয়ে।

তুই উত্তর দিয়েছিস, আমি লক্ষ্মী নই। আমি সনচরি।

সনচরি, সত্যি তুই আমার কাছে সনচরি নয়। তুই আমার কাছে দেবী লক্ষ্মী।

আবার সবাই সোফা, কোচে বসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

সকলের মনে একটা খুশির আমেজ আসছে। দোতলার বাতাস নিচে নেমে আসছে। ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের কানে কানে মনে মনে। সকলের ভেতরটা নেচে উঠেছে। মন অচেনা আনন্দের সায়রে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কি শুনছে সকলে উৎকর্ণ হয়ে এত?

গান। গান।

একটা মৃতসঞ্জিবনী গান। প্রাণ বাঁচান গান। নতুন জীবনের জন্মের গান।

যখন বিধুরেখার মনে শান্তির ধারা বয়ে গেছে, তখনই সে অর্গান বাজিয়ে এই গানটি গেয়েছে। এই গানটি ওর অতি প্রিয়। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গজল। কমলা ঝরিয়ার রেকর্ডে।

*প্রাণে তোমার প্রাণ মিলিয়ে সই*
*প্রাণে প্রাণে প্রাণের কানে*
*প্রাণের কথা কই।*
*আঁখি নটীর নাচন দেখে*
*ময়ূর নাচে ঐ*
*দোলনচাঁপার আতর মেখে*
*কোকিল ডাকে ঐ*
*হৃদয় আমার হারিয়ে গেছে*
*তোমার কাছে গো*
*পড়ে মোহন বাহুর বাঁধন*
*বন্দি হয়ে রই*

গানটার সঙ্গে ঘরের সকলেই গলা মিলিয়েছে।

সনচরি, তার প্রিয় বন্ধু মনোশোভা—নীলাম্বর দাদুর নাতনি। এমনকি নীলাম্বর দাদু, তীরথ-মা পর্যন্ত।

সকলে এ ঘরে এখন এক বয়েসি।

সকলেরই চোখের জলে হাসির ঝিলিক।



তীরথ-মা এবার পুরোদমে সনচরিকে তৈরি করার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দরজা বন্ধ করে মনের শক্তি বাড়ানর ধ্যান শেখাচ্ছে। ধরমিয়াকে সে সময় ঢুকতে দেয়া হয় না।

ধরমিয়ার নাকি কিছু হবে না। তার মনটা নাকি একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে ঘোরে। বড় আত্মসুখি। নিজেকে নিয়েই থাকব খালি। নিজের সুখ-সুবিধে। নিজের দুঃখটাই বড। অপরের দুঃখ দুঃখ নয়। দেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

এত স্বার্থপর মানুষ ভালো কাজের অযোগ্য।

আত্মসুখ ছাড়তে পারলে তবেই তীরথ-মা শেখাতে পারে।

শুনেই ক্ষেপে উঠেছে ধরমিয়া। —বুঝেছি। বুঝেছি। আমাকে সরিয়ে দিয়ে ডাইনি বিদ্যা শেখান হচ্ছে সনচরিকে। সব বুঝি। সব জানি।

তীরথ-মা সনচরিকে বলেছে, কোনো কথায় কান দিসনি। নিজেকে সংযত রাখবি। এদের কথাবার্তা জানবি অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর সংযম পরীক্ষা। কে কি বলল, কে কি না বলল, পরোয়া করবি না। এগিয়ে যাবি। এগিয়ে যাবি। একদম পেছু ফিরে তাকাবি না। গায়ত্রীর মধ্যেই সব কিছু রয়েছে। সূর্যের তেজের আরাধনা, বরণীয় তেজ আমাদের প্রেরণা দিক।

নিজের ভেতরের অন্ধকার দূর করতে পারি যেন।

নিজের ভেতরের আলোয় অন্যের ভেতর আলো যেন ভরিয়ে দিতে পারি।

সূর্যের সকালের লাল রঙের ধ্যানে নিত্য নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি যেন হয় ভেতরে। দুপুরের নীল রঙের চিন্তায় যেন সেই জ্ঞানকে বজায় রাখার শক্তি বৃদ্ধি হয়। সন্ধের শাদা আলোয় সব রঙেরই আলো মিশে থাকে। কিন্তু সে আলো উগ্র নয়। প্রবৃত্তির উত্তেজনা নয়। শান্ত। স্নিগ্ধ।

তিনটি আলোর মধ্যে তুমি বসে আছ। লাল নীল শাদা।

নাভি অবধি লাল। কণ্ঠ অবধি নীল। তারপর থেকে মাথা অবধি শাদা। এই তিনটি আলোর মধ্যে তুমি বসে আছ। তোমার মনে বুকের শব্দে বেজে উঠছে—ওঁ ভূ ভূবঃ

স্ব তৎ সবির্তু বরেণ্য ভর্গ দেবস্য ধীময়ী ধীয়ো নো প্রচোদয়াৎ ওঁ...।

তোমার ভেতরে জেগে উঠেছে শান্তি আনন্দ দিব্য জ্ঞান। তুমি সবার শান্তি আনন্দ মঙ্গল। তোমার স্পর্শে তোমার দৃষ্টিতে তোমার বাক্যে অন্যের মধ্যেও সুস্থ মনের জন্ম হবে। তোমার গুণের অধিকারী সেও হয়ে উঠবে।

এই চিন্তাটা সকাল দুপুর সন্ধে—তিনবার। নয়ত একবার, শুধু সকালে।

প্রতি বারে কতক্ষণ?

গায়ত্রী মন্ত্রটা এক এক বাবে অন্তত তিনবার থেকে পাঁচবার করতে হবে।

বিশ্বাস আর নিষ্ঠার ভেলায় চড়ে উত্তরণ হয়েছে সনচরির সাধারণ থেকে অসাধারণে।

লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সনচরি-কাহিনী।

সনচরির কথায় জাদু স্পর্শে জাদু দৃষ্টিতে জাদু।

সকালে গোরুর গাড়িতে বসে গ্রাম প্রদক্ষিণ করছে সনচরি। গাইছে।

*ছোটি ছোটি গাইয়া*
*ছোটে ছোটে গোহাল*
*ছোট সো মেরো*
*মদনগোপাল*
*কালি কালি গাইয়া*
*গোরে গোরে গোহাল*
*শ্যাম বরণ মেরো*
*মদনগোপাল*
*ছোটি ছোটি নখটি*
*ছোটি ছোটি হাত*
*বংশি বাজাওয়ে মেরো*
*মদনগোপাল*
*ছোটি ছোটি সখিয়াঁ*
*মধুবন বাগ*
*রাস রচাওয়ে মেরো*
*মদনগোপাল।*

সোনার গলায় সোনার গান গেয়ে চলেছে সনচরি। মাঠে মাঠে পাকা ধানে

সোনালি ঢেউ।

অঘ্রাণের শেষ।

বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ।

সনচরির পরনে কমলা রঙের ঘাগরা-কুর্তা। গোরুর গাড়িতে দুটো বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই রামদানার নাড়ু।

সনচরি গাইতে গাইতে যাচ্ছে। চিৎকার করছে—এ লড়কা লোগ! আ যাও। আ যাও। তুম লোগোঁকে লিয়ে হম হাজির। জলদি আও। জলদি আও। লাড্ডু লুট জায়গা।

পড়িমরি করে দু গ্রামের ছেলেরা মেয়েরা ছুটে ছুটে আসছে। মা-বাপের ডাকাডাকির পরোয়া না করে।

সনচরির গাড়িতে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

সনচরি দেয়ার আগেই যে যার মতো ঝুড়ি থেকে তুলে তুলে নিচ্ছে। সনচরি বলছে, এ লড়কা লোগ লেড়কি লোগ অকেলা মত খাও। সব কো দেকে খাও।

ছেলেরা-মেয়েরা চিৎকার করছে—এ সনচরি মাঈ। এ সনচরি মাঈ।

সনচরি বলছে, চুপ রও। চিল্লাও মত।

ছেলেদের মায়েদের মধ্যে হাসি-মশকরা চলছে সনচরিকে নিয়ে।

কেউ বলছে, সত্যি সত্যি সনচরি ছেলে-মেয়েদের হাত করে ফেলল রে।

আর একটি বৌ নিম ডালের দাঁতন দাঁতে ঘষতে ঘষতে বলছে, আর ছেলে! ছেলের বাপেরাই পাগল! দেখ চেয়ে, তোর বর উঁকি মারছে দরজার পাশ দিয়ে।

কোমরে দু হাত দিয়ে একটি বৌ বলে উঠেছে, সনচরির সাধ্যি কি আমার বরকে কেড়ে নেয়! চোখে চোখে রেখে দিয়েছি। দেখ দেখি আমার ঘর থেকে কেউ উঁকি মারছে কি না! যেমন শাসনের ছিরি! ঐ দেখ না, ধরমিয়াটার শাসনে একটা হনুমান হয়েছে সুদাম। আটকাতে পেরেছে! দেখ ঘাসের আঁটি নিয়ে দৌড়চ্ছে গাড়ির পেছন পেছন। কি না গোরু যাবে। গোরুকে খাওয়ালে পুণ্য হয়।

আরে বাপু, আর কি গোরু নেই নাকি সনচরির গাড়ি ছাড়া! একঠো না একঠো বাহানা চাহিয়ে সব কো!

ছেলেদের আটকান চলবে না। ওরা রামদানার নাড়ু খাবে। কারও কথা শুনবে কেন!

কি ধূর্ত মেয়ে ঐ সনচরি! ছেলেদের হাত করেছে কী ভাবে দেখ! বশ করেছে খাইয়ে খাইয়ে।

ধড়িবাজ আর আছে কোথায়! দেখলে, যা ভেবেছি ঠিক তাই। এতক্ষণ

মদনগোপালের গান গাইছিলি ভালোই। ঠাকুরের নাম করছিলি ভালো। তবু যদি তোর দুষ্টু মনটা ভালো হয়।

ওমা, যেই গাড়িতে উঠেছে ছেলেরা-মেয়েরা, কি গানটা গাইছে শোন।

একজন শুনে বলল, কেন ভালো গানই তো গাইছে—

*ঝুটে জগ কি ঝুটি প্রীত...*

শোনো কথা, এটা নাকি খারাপ নয়।

এর চেয়ে আর কি খারাপ কথা হবে শুনি!

জগৎ মিথ্যে, সব মিথ্যে। এ বাচ্চাদের কি মাথা খাওয়া হচ্ছে না! এখনই তো বাচ্চারা বলতে শুরু করে দিয়েছে, মিথ্যের জগতে মিথ্যে কাজ করবে না তারা। আচ্ছা বল, তা-লে সংসার চলবে কি করে! ক্ষেত-খামার দেখবে কি করে! বাপ-মা তো চিরকালই ছেলেমেয়েদের আশা করে বসে থাকে। সর্বনাশটা কোথায় এবার দেখ খতিয়ে।

আরে, এই মেয়ে! গালে হাত দিয়ে কি দেখছিস, ভাবছিস! পুত-ভাতারকে সামলা। সব যাবে। তিন মাথা যার, বুদ্ধি নিবি তার।

থুড়ি থুড়ি। আমার এখনও তিন মাথা হয় নি। সবে এই চল্লিশে পা দিয়েছি।

আদমি বলে, এখনও রূপ কি তোমার! কোথায় লাগে সনচরি! যাদের চোখে ছানি পড়েছে, তারা সনচরিকে সুন্দরী দেখছে।

মরদকে জিগ্যেস করি, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস কেন সনচরির গলার আওয়াজ পেলে?

মরদ চোখ ঘুরিয়ে গোঁফ পাকিয়ে, এক গাল হেসে বলে, তুই বুঝবি কি করে আমার মতলব! ঐ নাড়ুর লোভে দাঁড়িয়ে থাকি। ছেলেটাকে পাঠাই। দুটো করে নাড়ু এনে দেয়। নাড়ু ভারি ভালো বানায় সনচরি।

কি-ই-ই—গর্জে ওঠে বৌ। আমি নাড়ু ভালো বানাতে জানি না! আরে মোরি মাঈয়া। কোন আদমির হাতে আমায় দিয়ে গেলি রে।

সঙ্গে সঙ্গে জোঁকের মুখে নুন। মরদ পা জড়িয়ে ধরে বলে, চুপ কর। চুপ কর। চুপ কর। সবাই শুনতে পাবে।

ইঁদারার ধারে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের বৌ-গিন্নিদের নানা বচসা। তর্কাতর্কি। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। প্রায়ই হয়। স্বপক্ষ-বিপক্ষের লড়াই।

বিপক্ষের লোকেরাই সব সময় জেতে। সনচরির বিপক্ষে যারা—সনচরি তাদের ঘরের জমির ভিতে নাড়া দিয়েছে। স্বামী-পুত্রকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঘর ভাঙছে পর পর।

বুড়ি মাসি! তুমি মত দাও। গ্রাম যে যায়।

বুড়িমাসি কাঁপা গলায় বলেছে, কি আব বলব বল। সেই বয়েস কি আর আছে, আমি তোদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব। সমকক্ষ হতে পারব। সত্যি কথা বলে কি রেহাই পাব! জিগ্যেস যখন করলি, তখন বলতেই হয় সত্যি কথাটা। সনচরি কি বেইমানদের ভালো করে নি কোনোদিন? ওদের ছেলে স্বামীদের অসুখে-বিসুখে কত সাহায্য করেছে। তোরা তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোস। রাত জেগে সুস্থ করে তবে গেছে। একটু জলগ্রহণও করেনি কারও ঘরে।

এভাবে আড়ালে-আবডালে এমন নিন্দেমন্দ করা উচিত নয়। মুখ খসে যাবে। পোকা ধরবে।

একজন বলে উঠেছে, আ মরণ! বুড়িটা বলে কি রে। এতো উল্টো উজানে বইতে শুরু করেছে। দালাল। দালাল। সনচরির দালাল। বুড়িটাও ডাইনি। চেহাবা দেখছিস না। দুর হ। দূর হ। এখান থেকে দুর হয়ে যা। একজন তো ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিলে বুড়িমাসিকে।

বুড়িমাসি হুঁ-উঁ-হুঁ—করে চিৎকার করে উঠেছে।

বড্ড লেগেছে। বড্ড লেগেছে।

কি হাসির হুল্লোড়। সকলে মিলে হা-হা হি-হি হো-হো।

নে, নে। একটু ভগবানের নাম কর। নাম কর। বুড়ি ডাইনিটার শাপমন্যি কেটে যাবে। কি বিড় বিড় করে বলছে।

সকলে গাইতে শুরু করেছে। সনচরিরই গান।

*ছোটি ছোটি গাইয়া*
*ছোটে ছোটে গোহাল*
*ছোট সো মেরো*
*মদনগোপাল...*

একজন বললে, ওরে ওরে, এবার থাম থাম। সনচরি এবার গান ধরেছে। একগাদা ছেলেদের নিয়ে গেছে। সঙ্গে মেয়েরাও আছে।

একজন হাততালি দিয়ে সপ্তমে গলা চড়িয়ে বলে উঠেছে, এই মরেছে! আমার ছেলে দুটো গেল কোথায়!

এই জওয়ান এই পালোয়ান—কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো। নিশ্চয় গাড়ি করে গেছে। হায়। হায়। হায়।

বৌটা কপাল চাপড়াচ্ছে। বুক চাপড়াচ্ছে। —কি হবে উপায়! নিশ্চয় সনচরির গাড়িতে ওরা গেছে। এতো দেখছি ওদের মাথা খারাপ করে দেয়ার, নিষ্কর্মা করে

দেয়ার গান গাইছে সনচরি।

সর্বনাশের মাথায় পা।

বাতাসে ভেসে আসছে সনচরির গান—

*ঝুটে জগ কি ঝুটি প্রীত*
*দুনিয়া কা দিল*
*রহেন কা সপনা*
*মোহনগর মে চ্যায়ন কা সপনা*
*রূপ অনরূপ হ্যায় নয়ন কা সপনা*
*কাফি হাবে কি সি কি জিত*
*ভুখা হ্যায সংসারোঁ ধোকা*
*নর মে ধোকা নারী মে ধোকা*
*প্রেম মে ধোকা পেয়ার মে ধোকা*
*ফিকি তানে বেরসিক গীত*

মিথ্যে জগতে প্রেম ভালোবাসা, সবই মিথ্যে। সবই দু দিনের খেলা। অমর হয়ে থাকার চিন্তাটাও মিথ্যে স্বপ্ন। যা কিছু চাওয়া যায—সবই মিথ্যে। কিছুই থাকে না স্থায়ী হয়ে। সংসার মায়াজাল—ধোঁকা। নর-নারী সব মায়া। প্রেম-ভালোবাসা—সবই মায়া। কজনের এ সত্যি জ্ঞান হতে পারে? এই মিথ্যেতেই হাবুডুবু খায় সবাই। হেরে যায়। জেতে হয়ত দু-একজন। এ যেন বেতালা বেসুরো গানের জগত। নেই আসল সুর। নেই আসল গান। নেই আসল তান।

সকালের বাতাসটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সনচরিদের পাশের গ্রামের আকাশের বাতাস।

পাঞ্জাবি ছেলেটি—মনদীপ সিং এ গ্রামে ও গ্রামে ঢুকে গেয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

*যেতে কিথে কি সি নীল পেয়ার পাইদা...*

মিল যেন থাকে। ভালোবাসায় যেন বিচ্ছেদ না ঢোকে। যাতায়াতটা থাকে যেন।

সত্যিই পাশাপাশি গ্রামে কেউ ভাবতে পারত না আলাদা গ্রাম। এ গ্রামে ও গ্রামে ছেলেমেয়েরা হরদম আসছে যাচ্ছে।

এ গ্রামের ছেলের সঙ্গে ও গ্রামের মেয়ের বিয়ে।

ও গ্রামের মেয়ের সঙ্গে এ গ্রামের ছেলের শাদি।

দু গ্রামের লোক দুটো গ্রামেরই তো মানুষ। নয় কুটুম নয় জন্মভূমি।

কি করে বিচ্ছেদ হবে! কেন ঝগড়া হবে। বুঝে উঠতে পারা যায় না। তবু যেন সন্দেহের মেঘ একটা এগিয়ে আসে উত্তরের আকাশ থেকে।

সে কি সনচরি-পর্ব?

অলুক্ষণে কথা মুখে না আনাই ভালো।

সনচরির গ্রামের লোকেদের বেশির ভাগই সনচরির পক্ষে। কিন্তু পাশের গ্রামে কিছু তার পক্ষে। কিছু বিরুদ্ধে।

আর সেটা বেশি প্রচার হয়েছে ধরমিয়ার তরফ থেকেই। সে সনচরির অতিপ্রিয় বন্ধু, সনচরিদের গ্রামেরই মেয়ে।

বর যেন আর কারও হয় না। একা ধরমিয়ারই হয়েছে।

খালি ভয়।

সনচরি না কেড়ে নেয়।

ছেলেটা—কিশোরাকে সনচরি খুবই ভালোবাসে।

বলতে গেলে প্রাণের অতীত বললেও ছোট করে বলা হয়।

সনচরির গ্রামের লোকেদের বেশির ভাগ লোকের বক্তব্য এটাই—ধরমিয়া তো এই গ্রামেরই মেয়ে! সেইবা কেমন করে এই গ্রামেরই অন্য একটা মেয়েকে ডাইনি সাজায়! ডাইনির লক্ষণ, নমুনা সনচরির মধ্যে কোত্থেকে পেয়েছে ধরমিয়া! আর ধরমিয়ার মনোভাব অনেক জওয়ান অনেক জেনানাকে পেয়ে বসেছে।

একবার যদি অবুঝদের অজ্ঞানীদের কোনো কিছু পেয়ে বসে, সে বিষবৃক্ষ সে সময় চারা হলেও ভবিষ্যতে বিশাল হয়ে ওঠে। তখন কেটে কেটেও তাকে শেষ করা যায় না, উপড়ে ফেলার কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ গ্রামের মানুষের মনে সেই ভয় দানা বাঁধছে।

এই গ্রামের আতঙ্ক ও গ্রাম না সত্যিকারের ডাইনি সাব্যস্ত করে ফেলে সনচরিকে।

ও গ্রামের ভয়, সনচরি সত্যিকারের ডাইনি। তাদের সর্বনাশ। তারা স্বামী-পুত্র ছাড়া হয়ে পড়বে। স্বামী পুত্ররা আর কোনো কিছুতেই মন দেবে না। পৃথিবীর সব কিছু মিথ্যে মাথায় ঢুকে যাবে। খেত-খামারের কাজ ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকবে এবার।

এসব আলোচনা. সমালোচনা কানে গেছে নীলাম্বরের। কানে যাচ্ছে তীরথ-মায়ের। কী করে বাঁচান যায় সনচরিকে! কী করে মানুষের মাথা থেকে সংস্কার হয়ে বসছে যে জিনিসটা, তার মুল তুলে ফেলা যায়!

দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা।

ছেলেদের নিয়ে তীরথ-মা-র কাছে গেছে। তারা প্রার্থনার মতো গান গেয়েছে—

*ঝুটে জগ কি ঝুটি প্রীত...।*

সনচরিকে দেখে ময়ূরটা এগিয়ে আসছে। এসেছে।

পেখম তুলে নাচছে।

সনচরি তার মুখে লাড্ডু পুরে দিচ্ছে।

ময়ূর আনন্দে চিৎকার করে উঠেছে।

দেখতে পেয়েছে দূরে একটা সাপ যাচ্ছে।

ময়ূরটা এগোবার আগেই লাফিয়ে গিয়ে সাপটার ল্যাজ ধরে তিনপাক ঘুরিয়ে ফেলে দিয়েছে ময়ূরের সামনে।

সাপটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে গিলতে শুরু করেছে ময়ূর।

ছোট-বড় রঙ-বেরঙের অনেক পাখি উড়ে এসে বসেছে।

বানর হাত থেকে চাইছে নাড়ু। সনচরি নাড়ু বিলোচ্ছে। আর হাসছে।

তীরথ-মা তাকিয়ে দেখছে। এ হাসি তো ডাইনির নয়। এ তো দেবীর হাসি।

পাখিরা হাঁসেরা ঘিরে ধরেছে সনচরিকে।

শোনা যায়, পশুরা অপদেবতার আগমন বুঝতে পারে নাকি! যা মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়। সেই পশু-পক্ষিই তো ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সনচরির বুকে মাথায় পিঠে।

তীরথ-মা দেখছে অপলকে। মা, না! মা তো এই রকমই হবে। সেই পশু, পক্ষি, জীব-জন্তুরও মা। দেবতারও মা। অসুরেরও মা।

ধরমিয়ার কথাটা একবার মনে দোলা দিয়েছে তীরথ-মা-র।

ধরমিয়া নাকি শুনেছে কোনো লোকের মুখে, কোনো গুণিনের মুখে—এদের কাজকর্মে যা দেখা যায় তা মায়াজাল। স্রেফ মায়াজাল। সত্যি নয়।

ডাইনিরা মোহবিস্তার করে নানা রকমে। যদি বুঝতেই পারলে, সে আর ডাইনি হলো কেমন করে! যদি ধরতেই পারলে, তাহলে ডাইনির অস্তিত্ব রইল কেমন করে!

এদের চোখে মোহের কাজল।

সেই কাজল অদৃশ্য থেকে যায় সবার চোখে।

তীরথ-মা কি ভুল দেখে, না সত্যি দেখে?

জিভ কামড়ে, নাক-কান মুলে জোড়হাত করে বলে তীরথ-মা—বিবেক, ওদের ক্ষমা কর। কারও বিষয়ে খারাপ চিন্তা করাটাও তো অন্যায়।

সনচরি পুকুর পাড়ে গেছে।

সুন্দর জল। মুখ দেখা যায় বললেই হয়।

পাশের গ্রামের ওরাও এখান থেকে জল নিতে আসে—এত ভালো।

মুখ হাত পা ধুয়ে আসছে।

ওর বন্ধু, সইয়েরা ওকে দেখে দলবেঁধে ছুটে এসেছে ওর কাছে।

সনচরি!

রাতিয়া এসে ওকে বলেছে, সনচরি তুই ঐ গানটা গা—

*পিয়া মোরা বালক.*

গাইছে সনচরি। গাইতে গাইতে চলে আসছে তীরথ-মা-র বাড়ি।

পেছন পেছন দলবেঁধে ওর মেয়েবন্ধুরাও আসছে।

*পিয়া মোরা বালক*
*হম তরুণী হে*
*কোন তপ চুপ কইলা*
*ভেল জননী হে*
*পিয়া কে গোদ লেকে*
*চললো বাজা রো*
*হাটিয়া কি লোক পুছে*
*কে ছাতু তুহার*
*ভেল ও জননী...*

সকলের হাসিতে বাতাস মেতে উঠেছে।

পতঙ্গা বলেছে, পিয়া তোর কোলে, তুই তরুণী। পিয়াকে নিয়ে কোলে করে বাজার যাচ্ছিস। বাজারের লোকেরা তোকে জিগ্যেস করছে, কোলে কে? তুই বলছিস যে, কত জনমের পুণ্যে আমি পিয়ার মা হয়েছি। তোর একথাটা মেনে নিলাম। কারণ বড়রা অনেক সময় বলে, স্ত্রী কখনও কখনও স্বামীর মা হয়ে যায়। যখন স্বামী অসুস্থ। সেবাতে স্ত্রী মা। কিন্তু স্বামীকে তো কোলে করে নিয়ে বেড়ান যায় না। তোর পিয়া কেমন দেখা না একবার! রোজ তো দেখাব দেখাব বলিস। আর গান গাস।

সনচরি হাসতে হাসতে বলেছে, নিশ্চয় দেখাব। নিশ্চয় দেখাব। আজই দেখবি!

রয়েসয়ে দেখলে ভালো হতো।

রয়েসয়ে হলে আর দেখা হবে না। রোজই তোর রয়েসয়ে।

ও বাবা, কথার ভর সয় না! ঠিক আছে, দেখাচ্ছি। চোখ বুজে জোড় হাত করে দাঁড়াও।

কেন, ম্যাজিক নাকি? সত্যি পিয়া কেউ নেই তাহলে!

ম্যাজিক নয়, সত্যি।

সকলে জোড়হাতে চোখ বুজে আছে।

তীরথ-মায়ের ঘরে ঢুকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে।
কি একটা কোলে করে নিয়ে আসছে যেন।
বাইরে আলোতে আসতে পরিষ্কার দেখা গেছে।
এই চোখ খোল সব।
চোখ খুলে দেখেই সবাই প্রণাম করছে মেঝেতে।
কৃষ্ণমূর্তি।
সুন্দর সাজান।
সনচরি রোজ সাজায়।
এই সনচরির পিয়া!
শত শত প্রণাম। অসংখ্য প্রণাম।
দূর থেকে তীরথ-মা দেখে অবাক। বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠেছে।
কাকে দেখছে! রাজপুতানি, মেবার রানি, সে যুগের সেই মীরাবাঈ!
এ কেমন করে হয়! চোখের মাথা খেয়েছে নাকি!
দু চোখ ভালো করে দু হাতে রগড়ে নিয়ে বড়.বড় করে তাকিয়ে দেখেছে।
সত্যি কি! না, মনের কল্পনা! মনের ধারণা! এ একেবারে সাক্ষাৎ মীরাবাঈ।
না, না এতো সনচরি।

এমন দেখল কেন? কৃষ্ণ কোলে করে মীরাবাঈয়ের প্রাসাদ ত্যাগের দৃশ্যের মতো!

তাহলে ওকি থাকবে না মোটে?
চলে যাবে?
তীরথ-মা ওকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে।
অনেক আশা। হয়ত এটা দুরাশা। সব আশা মানুষের তো পূর্ণ হয় না।

দেখেছে। ভেতরের চোখ দিয়েই দেখেছে। ও মেয়ে সাধারণ নয়। অসাধারণ। ওর মধ্যে একটা শক্তি রয়েছে।

শেষ অব্দি কি জানে না। বলতে পারবে না। বোঝাতে পারবে না। এটুকু স্থির বিশ্বাস ছিল অনেক ভালো কাজ। অনেকের ভালো ওকে দিয়ে করাতে পারা যাবে।

ওর দৃষ্টিতে ওর নিশ্বাসে ওর মনে ভালো ছাড়া মন্দের লেশমাত্র নেই। সেটা অন্যের বেলায়ই। নিজের বেলায় নয়।

বুক ভাঙা নিশ্বাস ঝরে পড়েছে তীরথ-মায়ের।
নিজের নিশ্বাসে নিজেই চমকে উঠেছে। এ যেন ঘূর্ণিঝড়ের আবহাওয়া।
সনচরির যাতে মঙ্গল হয়, ও যদি চলে যেয়েই সুখি হয়, তাই হোক।

তীরথ-মায়ের দেখা ভাবা যেন মিথ্যে হয়ে যায়।
কৃষ্ণমূর্তিকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেছে সনচরি।
বন্ধুরাও যে যার ঘরে।
হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে তীরথ-মা।
বাতাসে ভেসে আসছে সমবেত কণ্ঠস্বর। ভজনে। কৃষ্ণের।

*গোবিন্দ জয় জয়*
*গোপাল জয় জয়*
*রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়..*



নিজের করে ধরে রাখার চেষ্টা তীরথ-মা-র বরাবরের।

স্বামীর বেলায়ও কি হয় নি?

যে কাজের লোক দশ বছর ধবে ছিল, স্বামীর সুবিধে-অসুবিধে বুঝেছে, ঠাণ্ডায় গরম কফি, গরমে বরফ দেয়া আম-পোড়া শরবত মুখে এনে ধরেছে, তীরথ-মা তখন ক্ষেপে উঠেছে।

সে কি ভীষণ মূর্তি!

একটা সুন্দরী নারী যে মুহূর্তে নির্দয় ভয়ঙ্করী মূর্তি হয়ে যেতে পারে, সেটা যারা দেখেছে, তারাই সত্যি বলে জানে। যারা দেখে নি, তাদের কাছে অবিশ্বাস্য। গল্প। বানানো বলে মনে হবে।

তখন কিন্তু তীরথ-মা নাম ছিল না আজকের তীরথ-মায়ের। ছিল বাবার দেয়া নাম স্নিগ্ধাপ্রীতি।

হলফ করে বলতে গেলে স্নিগ্ধাপ্রীতির মধ্যে এতটুকু স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা ছিল কি?

না না না।

স্নিগ্ধাপ্রীতি জানে নি কখনও ভালোবাসা, প্রীতি মমতা কাকে বলে! তাই নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে গেছে স্বামীকে। চূড়ান্ত মানসিক।

কাজের লোকের হাত থেকে মুখে ধরা শরবতের গেলাস ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। চুবমার। সারা ঘর নানান-রঙের নকশা আঁকা কারপেটে কাঁচ ভাঙা ছোট বড় টুকরোয় ছড়াছড়ি।

কফির বেলাও ঐ।

স্বামীর কাছে কেউ এলে, যত্ন করলে কেন যে এমন পালগামিতে পেয়ে বসে, স্নিগ্ধাপ্রীতি একা বসে অনেক ভেবেও কোনো কূল-কিনারা খুঁজে বের করতে পারে নি।

যারা স্বামীর অতি প্রিয়, অতি আদরের, বহু পুরনো—এমন কি কোলে-পিঠে

করে মানুষ করে বৃদ্ধ হয়ে গেছে যারা, কেউ বাদ পড়েনি স্নিগ্ধাপ্রীতির রোষের আগুন থেকে।

আগুনই বটে।

রেগে গেলে ফরসা মানুষ, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

আগুন ছিটকে বেরয় আর কি!

প্রত্যেককে বাড়ি থেকে বিদায় না করে স্বস্তি পায় নি। শান্তি পায় নি।

স্বামী এত ভালোমানুষ, মাটির মানুষ বললেও ভুল বলা হবে না, একেবারে চুপচাপ। বুঝি মূর্তি একখানা।

সময় সময় মনে হয়েছে, দেহে কি প্রাণ আছে? মানুষটার কি বোধ আছে? এ কি পাথর না কি! না ইস্পাত?

কোনো দিনের জন্যে কোনো কটুকথা বলে নি। কোনো রাগ প্রকাশ করে নি। নীরবে বেরিয়ে গেছে বাড়ির বাগানে।

ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখেছে স্নিগ্ধাপ্রীতি গাছের ফুলের সঙ্গে খেলা করছে। গায়ে হাত বুলোচ্ছে। নাকের কাছে এনে শুঁকছে। আবার হাসিমুখে কোনো কোনো গাছকে জড়িয়ে ধরছে। দোলা দিচ্ছে।

গানের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে।

আশ্চর্য! বিচিত্র মানুষ বটে। এর জুড়ি ভূ-ভারতে পাওয়া দুষ্কর।

জাদুঘরে ধরে রাখার মতো।

মানুষটা গলা ছেড়ে গান গাইছে।

*'এত শঠতা এত যে ব্যথা/তবু যেন তায় মধুতে মাখা...'*

জ্বালার ওপর জ্বালা।

দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে আবার স্নিগ্ধাপ্রীতির।

তার রাগ অত্যাচারের পাল্টা রাগ অত্যাচার বা প্রতিবাদ না করে মানুষটা বেশ আনন্দ উপভোগ করে দেখা যাচ্ছে।

আনন্দে ডগমগ একেবারে।

সহ্য করতে পারেনি স্নিগ্ধাপ্রীতি।

রাত বাড়ছে।

দৌড়ে গিয়ে জামা ধরে টেনে নিয়ে এসেছে ঘরে।

তুমি বাগানে গান গেয়ে বেড়াবে, আর আমি এখানে বোস থাকব না ঘুমিয়ে! আমায় ভালো না লাগে বিদায় করে দাও। তোমার কাছে ঠাঁই যদি না জোটে আমার, রাস্তা ফুটপাথই সম্বল।

বসে বসে দেখছ কি হাঁ করে! শোবে না? আমাকে মুক্তি দাও তুমি। তোমার এ চুপ করে থাকা অত্যাচার অসহ্য।

হ্যাঁ।

মুক্তি পেয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

নির্মম সাজা।

তার কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগসুদ্ধ দিয়ে যায় নি স্বামী। এত নিষ্ঠুর! এত হৃদয়হীন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তাকে উগ্র রাগী করে তুলেছে।

কেন?

পৃথিবীতে তার কেউ নেই বলে কি তাকে নিয়ে ছেলেখেলা করে গেছে!

বয়েসের তফাৎ তো অনেকেরই থাকে। তার সঙ্গে বয়েসের কতই বা আর তফাৎ ছিল? দশ-এগার বছরের।

এটাকে কি বেশি তফাৎ বলা যায় পুরুষ-নারীর বিচারে!

একলা ঘরে একা বসে বসে নীরব কান্না।

এ কান্নার কি কোনো মানে হয়?

জ্যান্তে যাকে সুখি করতে পারে নি, মরার পর কেঁদে সারা হলেও কি নির্দোষ হওয়া যায়?

কখনই না। কখনই না।

সেবা করেছে।

যখন অসুস্থ, সর্দি জমে গেছে বুকের দু পাশে। শ্বাস নিতে কষ্ট। তখন প্রাণপণে চেষ্টা করেছে সারিয়ে তুলতে। বাঁচিয়ে রাখতে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

ডাক্তারদের হাতের জায়গায় দু পা জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

প্রাণ কি দেয়া যায় না?

প্রাণ দিয়ে প্রাণ কি বাঁচান যায় না?

ডাক্তারদের চোখেও জল।

আস্তে আস্তে বলেছে, স্থির হও। প্রার্থনা কর।

স্থির হয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি। প্রার্থনা করেছে মন্দিরে মন্দিরে।

প্রার্থনা করেছে স্বামীর কাছে।

যত দোষ-ত্রুটি আমার ভুলে যাও।

আমার জন্যেই এই অবস্থা আজ।

সহ্যের ফল কি পেলে তুমি!

যাওয়ার পথের নিশানা?

তুমি বল আমার আশ্রয় কোথায়? আমি জানি আমি মুখরা, আমি বদরাগী। কে বুঝবে আমায়! বল, কথা দাও। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে!

স্বামীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

স্বামী বলেছে, দেহ গেলে সব শেষ নয়। আমারও শেষ হবে না। আমি থাকব। চিরকালই থাকব। আর তুমি? তুমিও চিরকাল আমার আশ্রয়েই থাকবে।

জলভরা চোখে হাসির ঝিলিক স্নিগ্ধাপ্রীতির।

সত্যি বলছ?

সত্যি সত্যি সত্যি।

আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্বামীর দু গালে কপালে আলতো করে চুমু খেয়েছে।

অসুস্থ বাচ্চা ছেলেকে যেন আদর করছে তার মা।

স্বামী চলে গেছে।

এরকম মৃত্যু এর আগে দেখে নি স্নিগ্ধাপ্রীতি।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

মনে হয়েছে সম্পূর্ণ নিশ্বাসটা তার নিশ্বাসে মিলে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

চলে যাওয়ার পর একবারও মনে হয় নি স্বামী ছাড়া সে। স্বামী নেই।

স্বামী আছে।

তার সঙ্গেই আছে।

বাবার বেলায় এমনটি হয় নি।

বাবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই চলে গেছে।

পাশে শুয়ে থেকেও কোনো কিছু টের পায় নি স্নিগ্ধাপ্রীতি।

বাবার সহ্যশক্তি বাবার যন্ত্রণা মনে পড়লে সারা শরীর বরফ হয়ে আসে।

কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!

ভাবা যায় না।

স্নিগ্ধাপ্রীতির ওপর পাছে কোনো অত্যাচার হয়, সেই ভয়ে বাবা মুখ খোলে নি কোনোদিন।

সৎ-মা ভীষণ রাগী। কথায় কথায় জিনিসপত্র ভাঙাভাঙি ছোড়াছুড়ি।

কত দিন বাবার হাত কেটেছে। পা কেটেছে। রক্তারক্তি।

বাবাকে রাগতে কোনো দিন দেখে নি।

স্নিগ্ধাপ্রীতিকে বুঝিয়েছে কেবল—মাথাটা গেছে ওর! কোনো শান্তি-সুখ বুঝতে পারে না। এমন দুর্ভাগ্য আর কার আছে?

বাবার ওপর খুব রাগ হয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতির।

কেন শান্তি-সুখ বুঝতে পারে নি? তুমি বুঝতে দাও নি তাই।

মনের রাগ মনেই পুষেছে।

এই জ্বালার ওপরে বাবাকে আবার কিছু কথার জ্বালা দিতে চায় নি আর।

সৎ-মার রাগ। মেয়ে আছে জেনেছে। কিন্তু মেয়ের ইতিহাস তো জানান হয় নি। জেনেছে যখন, তখন নিজের ধর্ম রক্ষে করার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে বাবার সঙ্গে।

বাবা ম্লেচ্ছ। বাবা অচ্ছুৎ।

ছুঁলে জাত যাবে।

বামুন পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করেছে সৎ-মা।

এবার নাকি নিজের জাতে উঠেছে। ফিরে গেছে।

এরপর থেকে বাপ-মেয়েকে ছোঁয়া নিষিদ্ধ করে গেছে বামুন পুরোহিতেরা।

বাবা ঘরের দরজায় দাঁড়ালে বালতি বালতি জল ঢেলে দেবে সৎ-মা। গঙ্গাজল। গোবর জল ছড়াবে। অদ্ভুত আচরণ।

বাবা টাকা দিলে সেই সব টাকার নোট জলের বালতিতে ধোয়া হবে।

নিজে ছোঁবে না। কাজের লোক ধুয়ে দেবে।

গঙ্গাজলে ধুয়ে তবে হাতে নেবে।

প্রথমে কলের জলে পরে গঙ্গাজলে ধুয়ে টাকার নোট বিছানায় শুকোতে দেয়া হবে।

অদ্ভুত রীতিনীতি।

ঘরের দরজায় হাত লাগিয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

একটা কাঁচের কাপ ছুঁড়ে মেরেছে সৎ-মা।

বুক চেপে বসে পড়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

বাবা এসে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেছে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা একভাবেই গেছে বাবার ওপর দিয়ে। তার ওপর দিয়ে।

বারান্দায় শুয়ে থাকতে হয়েছে।

কোন অপরাধে! দশ বছরের মেয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে—কেন এ শাস্তি তাদের দুজনের?

কলাই করা ভাঙা থালায় ভাত ডাল রুটি কাজের লোক দিয়ে যায় বারান্দায়।

বাড়ির জল পাওয়ার উপায় নেই।

রাস্তার কলে জল ধরে খাওয়া।

কেন?

এত ঘেন্নার পাত্র তারা কেন?

গুরুজনদের মুখে তো অনেক কথাই শুনেছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।—যত্র জীব তত্র শিব। জীবের মধ্যেই শিব রয়েছে। তবে এত ঘেন্না, এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কেন?

জার্মানি থেকে এসেছে ভদ্রমহিলা সংস্কৃত শিখতে।

বাবা সংস্কৃতের বিখ্যাত পণ্ডিত।

ভদ্রমহিলা বাবার কাছে সংস্কৃত শিখবে বলে মনস্থির করে এসেছে বাইরে থেকে।

বাবা শিখিয়েছে। প্রাণ মন দিয়ে শিখিয়েছে।

শেখাতে শেখাতে প্রণয়।

তারপর শুভ পরিণয়।

মহিলার কোলে এসেছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

মায়ের মতোই দেখতে হয়েছে। চোখের মণি নীল। কটা চুল। গায়ের রঙটা খালি তামাটে। লম্বা, পাতলা পাতলা চেহারা। এক কথায় সুশ্রী, সুন্দরী।

পাঁচ বছর অব্দি স্নিগ্ধাপ্রীতির জার্মান মা কাছেই থেকেছে।

পাঠ শেষ হয়ে যেতে মেয়েকে নিয়ে বাবাকে নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যেতে চেয়েছে।

বাবা এ দেশ ছেড়ে যেতে চায় নি। মেয়েকেও ছেড়ে দিতে রাজি হয় নি।

মা চলে যাওয়ার পর অনেক কষ্টেসৃষ্টে নিজের বিদ্যাচর্চা একদিকে চালিয়ে অন্য দিকে স্নিগ্ধাপ্রীতিকে মানুষ করে তুলেছে বাবা।

এইভাবে বছর চারেক কেটেছে।

বিদ্যাচর্চার ক্ষতি হচ্ছে জেনে বন্ধু-বান্ধবরাই বাবার দ্বিতীয় বিয়ে সমর্থন করেছে।

উল্টোফল হয়েছে।

লেখাপড়ার চর্চা শিকেয় উঠে গেছে।

বাপের সাজা। মেয়ের সাজা। সৎমার মুখে গালমন্দ। হাতে জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি। বাপ-মেয়ের শরীর মনের ওপর নির্যাতনের শেষ নেই।

সামনের বাড়ির উত্তরপ্রদেশের লালা—কায়স্থ পরিবারের বাস।

বাড়ির গিন্নিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে সৎ-মার প্রতিদিনের অত্যাচার।

বাবা চলে যাওয়ার পর দুজনের ওপরের অত্যাচার এসে পড়েছে এক জনের ওপব। স্নিগ্ধাপ্রীতির ওপর।

চোখের জলে কেটেছে স্নিগ্ধাপ্রীতির দিনরাত।

মমতা ভালোবাসা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসে নি তাদের দুঃখকষ্টের সময়।

সহানুভূতিতে কেউ কাছে টেনে নেয় নি।

বুকে টানা তো দূরের কথা, পায়েও আশ্রয় দেয় নি।

এসব কথা বলা ঠিক সত্যি নয়।

একজনও তো টেনেছে। মায়ের স্নেহ-মমতা নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আশ্রয় দিয়েছে।

সে কে?

সে সামনের বাড়ির গিন্নিমা—সতীরানি।

এসেছে একদিন সৎ-মার কাছে কাজেব লোক খুঁজতে।

কথায় বার্তায সৎ-মা রাজি হয়েছে স্নেচ্ছকে বিদায় করতে।

সতীরানির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। স্নিগ্ধাপ্রীতিকেই চেয়েছে।

স্নিগ্ধাপ্রীতি জানে না তাব মাস মাইনে কত ঠিক হয়েছে। তবে সতীরানি প্রতি মাসে মুখ বন্ধ খামে টাকা যে পাঠিয়ে দিয়েছে, এটা দেখেছে স্বচক্ষে।

ঝিয়ের কাজ করতে গিয়ে স্নিগ্ধাপ্রীতি চাকরানি হয় নি কোনোদিন। ঝি—মেয়ে। বাড়ির মেয়ে। ঐ বাড়িরই মেয়ে হয়ে উঠেছে।

সতীরানি তাকে কোনোদিন কোনো কাজ কবতে দেয নি।

আহা, মেয়েটা কি কষ্টেই মানুষ হয়েছে! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। অপছেদ্দা অবহেলায় হলেও কুকুর-বেড়ালও এর চেয়ে ভালোভাবে থাকে।

যত বড় হচ্ছে, দেহের বাড় বাড়ছে।

রূপ যেন ফেটে ফেটে বেরুচ্ছে তত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে স্নিগ্ধাপ্রীতি আর ভাবে—এত রূপ দেহের কোথায় লুকিয়ে ছিল তার!

ষোল বছরে ষোড়শী-সুন্দরী।

তখনও জানতে পারে নি তার রূপমুগ্ধ এই বাড়িরই একজন।

কে সে?

গিন্নিমার বড় ছেলে—রামরতন।

রামরতন নিজেও কম সুপুরুষ নয়।

গিন্নিমা গুরুদেবের কাছে শুনে এসেছে বরাবর—মানুষ মানুষ। এখানে কোনো জাত-বেজাত ছোঁয়াছুঁয়ি নেই।

গুরুদেব 'সোহমপন্থী'।

পৃথিবীতে একই শক্তি রয়েছে। সে শক্তি আমি তুমি—সবাই।

একেই বলে বরাত ফেরা।

গিন্নিমা বলেছে, যা দৃষ্ট নয়। সেই হলো অদৃষ্ট। অদৃষ্টকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোর না কোনোদিন।

যাগযজ্ঞ করে গুরুদেব নিজে এসে চার হাত এক করে দিয়েছে দুজনের। রামরতন আর স্নিগ্ধাপ্রীতির।

স্নিগ্ধাপ্রীতি খুশি। মহাখুশি। রানি। মহারানি।

গিন্নিমার অতি আদরের বৌরানি।

সত্যিকারের ভালোবাসা কি দিতে পেরেছে স্নিগ্ধাপ্রীতি রামরতনকে?

বলতে একটু কুণ্ঠা।

ভালোবেসেছে মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে। তার ওপর থেকে রামরতনের নজর অন্য কারও ওপর পড়ুক এটা কোনোদিনই চায় নি। তাছাড়া সৎ-মার কাছ থেকে অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জর হয়ে পড়েছে। সে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারে নি কোনোদিন। প্রতিশোধ নিতে পারে নি কোনোদিন। তাই বুঝি সেই দুঃখ-ক্ষোভ, রাগ-অভিমান ভালোমানুষ রামরতনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহিনী মন তার শান্ত হতে চেষ্টা করেছে বার বার।

অকাতরে সহ্য করে গেছে রামরতন। স্নিগ্ধাপ্রীতির অতীত জীবন জানে বলে।

আশ্চর্য ঘটনা।

কতবার মনে মনে ভেবেছে কেন সে এত অত্যাচার করে? কেন তাকে রামরতন শাসন করে না! কেন কেন কেন! ভেবেচিন্তে বুঝে উঠতে পারে নি কিছু।

ভাবাটা সারই হয়েছে শুধু। আর সার হয়েছে মাথা ধরা। মাথা ঘোরা।

ভেবেছে চলে গেলে শূন্যতা কি করে পূর্ণ হবে?

একা সে থাকবে কেমন করে?

কিন্তু চলে যাওয়ার পর আর একবারের জন্যেও একা মনে হয় নি। শূন্যতা তো মোটেই আসে নি।

বরং নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয়েছে।

আছে। রামরতন আছে।

যায় নি। যাবে না কোথাও। দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হয় নি তার।

রামরতন তার সঙ্গে আছে। তার ভেতরে আছে। তার পাশে আছে।

সময় সময় মনে হয়েছে, চলা ফেরা বলা—সবের মধ্যে রামরতন। স্নিগ্ধাপ্রীতি নেই। তার অস্তিত্বও নেই যেন।

মৃত্যুর পরে লোকদের বলে দিয়েছে, মুখে আগুন যেন না দেয়া হয়।

শ্রদ্ধেয় আর প্রিয়জনেদের মুখে আগুন মানুষ দেয় কি করে!

তাজ্জব ব্যাপার।

ছি ছি ছি। মানুষের ঘটে যদি একটু বিবেক বুদ্ধি থাকে।

মুখে আগুন তো গালাগালি।

রামরতনের শ্রাদ্ধ করতে দেয় নি বাড়িতে।

পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, এসব করার মানেই মানুষটা 'নেই' ভাবা।

'নেই' সে ভাবতে পারবে না।

নিজের গলার সোনার মটরমালা খুলে পুরুতমশাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, জীবিকা নষ্ট করতে চাই না আমি। প্রণাম।

রামরতন চলে যাওয়ার মাসখানেক পর বাড়ির সকলের দৃষ্টি পড়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতির ওপর।

যা যা ভালোবেসেছে রামরতন—খাওয়া থেকে, গান থেকে, ঘর সাজান থেকে, আচার-ব্যবহার থেকে—সবেতেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

এমন কি সাজ-সজ্জাতেও।

রামরতনের প্যান্ট-শার্ট পরে রাতে বেরিয়ে যায় বাগানে। আদর করে ফুলেদের তুলে নিয়ে আসে। ফুলদানিতে রেখে দিয়ে অর্গান বাজাতে শুরু করে।

সুরে সুর মিলিয়ে গান ধরে—রামরতনের গাওয়া গান। একবার আধবারের নয়, বহুবারের।

বাড়ির সকলের কান এ গান শুনে অভ্যস্ত।

গায় যখন, সকলেই শুনেছে—গলার আওয়াজটা বুঝি রামরতনের।

রামরতনের গলা মিষ্টি-মধুর।

বাজনার গমক, গলার কাজ একই রকম।

অবাক কাণ্ড!

এক চুল তফাৎ নেই।

একেবারে হুবহু।

রাত এগারোটা।

এই সময়টায় সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

রামরতন গেয়েছে।

গানের আওয়াজ ভেসে আসছে বাতাসে বাতাসে। ঘরে ঘরে ঘুরছে-ফিরছে। একতলা দোতলা তিনতলা।

সতীরানি তিনতলার বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে।

*হায় মেরি মহব্বত*
*মুঝে সতায়ো না*
*দিল কা দর্দ*
*মুঝে না কর দিওয়ানা*
*তমান্না খো গ্যয়ি হ্যায়*
*দিল মেরি টুট গ্যয়ি হ্যায়,*
*না জানে কওন জানে*
*তেরে ঠিকানা*
*তালাশি মে মিলি নহি*
*মুলাকাত হুয়ি নহি*
*ঝুটে মেরে আফসানা*
*ঝুটি মেরি সোচনা*

*ভালোবাসা তুমি দুখ দিয়ে*
*ফিরে যেওনা*
*অন্তরের ব্যথা তুমি।*
*পাগল কোর না*
*ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে আশা*
*ভেঙে গেছে হৃদয় মন*
*মেটেনি পিপাসা*
*তবু পাইনি খুঁজে*
*তোমার আসল ঠিকানা*
*দেখি নি তোমায় তুমি কেমন*
*ভালোবাসার ধরন কি এমন*
*মিছে খোঁজাখুঁজি*
*মিছে ভাবনা*

বাড়ির কাজের লোকেদের আতঙ্ক ভর করেছে মাথায়।

কিসের আতঙ্ক?

ভূতের।

কার ভূত?

রামরতনের ভূত।

এ কেমন কথা?

শুনে সতীরানি, স্নিগ্ধাপ্রীতি রেগে উঠেছে।

রামরতন ভূত হতে যাবে কেন?

এসব কি রটনা!

খুব খারাপ। খুব খারাপ।

না না। সত্যি সত্যি।

দাদাবাবু রাত্তিরবেলা হলে ভাবিজির ঘরে আসে। তারা স্বচক্ষে দেখেছে।

বাড়িতে হুলস্থূল। পাড়ায় হুলস্থূল।

ওঝা আনতে দোষটা কি? কাজের লোকেরা ভয় পাচ্ছে। কাজেব লোকেবা দেখছে। সন্দেহটা ভেঙে দেযা তো উচিত।

যদি ধরাই হয, ভাবিজি এসব করছে মিছে—দাদাবাবুব কোটপ্যান্ট পরে ঘোবাফেরা করছে—তাহলেও তো ধরে নিতে হবে দাদাবাবু ভাবিজিকে ভর করে থাকে।

ভাবিজির আচাব-আচরণ তো এর আগে এরকম ছিল না কোনোদিন।

সব শুনে স্নিগ্ধাপ্রীতি নিজেই বলেছে, ঠিক আছে। এত যখন ভয়, এত যখন সন্দেহ—তখন ওঝা আনাও। ওঝা আমাকে ঝাড়ফুঁক করুক তোমাদের সামনে।

ওঝা এসেছে।

নামকরা বড় ওঝা। নামি। দামি। এর ওপর নাকি দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

অনেক সুপারিশ। গলায় বড় বড় মেডেল ঝুলছে। অনেক তাবড় তাবড় মস্তান-ভূতকে ঝেড়ে বিদায় করেছে। এতো সামান্য ব্যাপার। নিরীহ ভূত। এতো ওঝার বাঁ হাতের টুসকিতেই চলে যাবে।

বাগানে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

নিম গাছের ডাল ভেঙে নাকি ভূত চলে যাবে। না হয়ত জলভর্তি কলসি, নয়ত বা জুতো মুখে করে নিয়ে চলে যাবে।

সব সাজান হয়েছে।

বাগানের মধ্যিখানে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।

লম্বা চওড়া ওঝা উত্তরপ্রদেশের মানুষ।

মাথায় পাগড়ি। পাকান গোঁফ।

পরনে ফতুয়া-পাজামা।

পান খেয়ে খেয়ে দাঁত সব কয়লা-বর্ণ।

মাঝে মাঝে কাশছে। আর থু থু থু করে চারপাশে থুতু ফেলছে।

চেলা গাঁজার কলকেটা এগিয়ে দিচ্ছে। একবার টেনেই ছেড়ে দিচ্ছে। দপ করে জ্বলে উঠছে কলকের আগুন।

চেলা টানছে। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করছে।

চোখ রক্তবর্ণ।

এদের দেখেই তো মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ ভূত।

ধীর-স্থির হয়ে ওদের সামনে বসে আছে স্নিগ্ধাপ্রীতি।

ওঝা বলছে মুখে, ভূত প্রেত হট যায়গা। জরুর হটে গা।

এক মুঠো সর্ষে নিয়ে ছুঁড়ে মারছে আগুনে।

স্নিগ্ধাপ্রীতির মুখে-চোখে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না। আগেও চুপচাপ। এখনও চুপচাপ। মাঝে মাঝে চেলা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাকেই বুঝি ভূতে পেয়েছে।

সর্ষে পোড়া, হলুদ পোড়া, জুতো পোড়া—স্নিগ্ধাপ্রীতির নাকের কাছে পর পর ধরা হচ্ছে। চামড়া পোড়া বিকট গন্ধ।

স্নিগ্ধাপ্রীতি বিরক্ত হয়ে নাকে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে ঘরে চলে গেছে।

হা-হা-হা করে অট্টহাসি হেসে—ভূতের হাসিই বটে, ওঝা আর ওঝার চেলা বলেছে, ভূত ভাগ গ্যয়া। ভূত ভাগ গ্যয়া। ভূত ভাগ গ্যয়া। সব আদমিয়োঁ নে দেখা। আপনা আপনা আখোঁ মে দেখা।

ওঝাদের ওপর বিরক্ত হয়ে সতীরানি বলেছে, ইয়ে লোগ কো কুছ দেকে য়ঁহা সে বিদা কর দো। জলদি। জলদি। জলদি। যাও, তুরন্ত ম্যানেজারবাবু কো বুলাওঁ।

ভূত ছাড়ানর পালা চুকে যেতে সকলেই ভাবতে বসেছে, বড্ড একা হয়ে পড়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি। এই একা হয়ে পড়াটাই ওর মস্ত ব্যামো। একটা ছেলে থাকলে এমনটা আর হতো না।

দেরি না করে দেওরের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললে মনের দিক থেকে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

সতীরানির দিক থেকেই প্রস্তাবটা এসেছে। রামরতনের ছোট ভাই রামযতন।

ওর এখন প্রায় কুড়ি বছর।

স্নিগ্ধাপ্রীতিকে এই বিয়ের কথা বলতে চমকে উঠেছে। একি!

সে ছোট দেখেছে রামযতনকে। ছেলের মতো মানুষ করেছে। ওকে কোলে করে নিয়ে বেড়িয়েওছে। কত সময় রামযতন তাকে 'মা মা' বলে আঁকড়ে ধরেছে।

ছি ছি ছি। ভাবতেও লজ্জা।

না না না। মরে গেলেও সে এই বিয়েতে রাজি হতে পারে না।

'হ্যাঁ'-'না'-র টানা-পোড়েন এ বাড়িতে চলেছে অনেক দিন। নাওয়া-খাওয়া-শোয়া—সবেরই একটা বিশৃঙ্খলা।

এতে লজ্জা-ঘেন্নার কি এল! কেন বিভীষণ তার বৌদি মন্দোদরিকে বিয়ে করে নি? কেন সুগ্রীব কি তার দাদা বালির বৌ তারাকে বিয়ে করে নি? স্নিগ্ধার সবটাতে বাড়াবাড়ি। জানতে আর বাকি নেই। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছেলেটাকে খাক করেছে, যতদিন বেঁচেছিল। এখন স্বামী-সোহাগিনী হয়ে উঠেছে!

স্নিগ্ধাপ্রীতিকে শ্বশুরবাড়ির সকলের মতের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে, সে বাড়ি ত্যাগ করতে হয়েছে চিরদিনের জন্যে। লিখে দিতে হয়েছে স্বামীর বিষয়ের কোনো অধিকারী সে নয়। কোনো দিনের জন্যে এক পয়সা দাবি করতে পারবে না সে এ বাড়ি থেকে।

করবে না। করবে না। কোনো দিনই করবে না।

নীলাম্বরদা একই পাড়ার মানুষ।

মেয়ের ওপর জামাইয়ের অত্যাচারে ঘর বাঁধতে হয়েছে মধুবনির শেষের দিকে। সঙ্গে চলে এসেছে স্নিগ্ধাপ্রীতিও।

নীলাম্বরদা-ই তার বাড়ির কাছে একটা ছোট বাড়ি করিয়ে দিয়েছে নিজের খরচে।

এরপর তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে অনেক নীলাম্বরদার সঙ্গে। আগে পাড়ার মানুষ ছিল। এখন ওদের ঘরের মানুষ।

এক আশ্রয় গেলে আর এক আশ্রয় বুঝি তৈরি হয়ে থাকে তার জন্যে। স্নিগ্ধাপ্রীতিরও তাই। ছোটবেলায় যে মায়ের আশ্রয় হারিয়েছে, বড় হয়ে সে মাটির মায়ের আশ্রয় পেয়েছে। বাইরে বাইরে ঘোরার সময় বহু সাধু-সন্তদের সঙ্গে জানা-পরিচয়। অনেক শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছে স্নিগ্ধাপ্রীতি তাদের কাছ থেকে—মানুষের উপকারের জন্যে।

মধুবনির লোকেরা স্নিগ্ধাপ্রীতির নাম দিয়েছে তীরথ-মা।



চৈত্রের সকাল।

গাছে গাছে ফুল। ফুলে ফুলে প্রজাপতি। বসন্ত যাই যাই করে এখনও রয়ে গেছে।

নীল আকাশ।

আকাশের ছায়া পুকুরের টলটলে জলে। জলটাও আকাশের রঙ ধরেছে।

সনচরি চুবড়ি ভর্তি করে গুড়ের পাকের রামদানার নাড়ু নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসেছে।

তীরথ-মা এলোচুলে হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসেছে।

সনচরিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নীলাম্বরের ভেতরের ঘরে নিয়ে গেছে।

দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসেছে দুজনে। তীরথ-মা আর সনচরি।

পাশে খাটে আধশোয়া নীলাম্বর।

তামাক টানার নলের রুপো বাঁধান হাঙর-মুখটা ঠোঁটের ফাঁকে গোঁজা।

একবার করে টানছে, গুর গুর গুর গুর আওয়াজ। আবার ধোঁয়া ছাড়ছে। ধোঁয়াতে গোলাপ আতরের গন্ধ।

তাকিয়াটা বগলের তলায়।

দুচোখ আধবোজা।

বাঁ হাতে নল। ডান হাতটা উরুর ওপর।

বিছানায় সোনালী সার্টিনের বেডকভার বিছনো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর।

ঘাড় ফিরিয়ে তীরথ-মা বলেছে, নীলাম্বরদা, কথাটা একটু শোন ভালো করে। তোমার এটা শোনা বিশেষ দরকার। কি করা যায়, কি ভাবে চলা যায়, এখনই ঠিককরে ফেলা উচিত। এখনই সাবধান হওয়া উচিত।

গড়গড়ার পাইপটা বিছানায় নামিয়ে রেখে নীলাম্বর উঠে বসেছে।

কি ব্যাপার?

ভীষণ ভীষণ। খুব খারাপ।

পাশের গাঁয়ের মুখিয়া-প্রধান নাকি হিমালয়ের বিখ্যাত সাধক নিয়ে এসেছে।

গুণিনও বটে। মাথা থেকে খয়েরি জটা পা অবধি লুটোচ্ছে। দশাসই চেহারা। চোখ দুটো জ্বলছে। গোঁফ-দাড়ি ভর্তি। মাঝে মাঝে এক একটা হুংকার দেয়—হুম হুম। শুনে মানুষ আঁতকে উঠছে। ভয়ে জড়সড়।

পাশে চেলা গাঁজার কলকে ধরে রয়েছে। গুরুজির মুখে ধরছে একবার করে। পরে পেছন ফিরে নিজের মুখে ধরছে। গুরুজির প্রসাদ কিনা!

গুরুজি মহাত্মা।

দ্বিতীয় সমকক্ষ নেই কেউ আর।

শীতে বরফের ওপর দিয়ে, গরমে আগুনের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যায়। অদ্ভুত ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী।

ডাইনিদের বিভীষিকা।

এক লহমায় দেখেই ধরতে পাবে কোন ডাইনি গাছ, কোন ডাইনি জন্তু। এর হাত থেকে কোনো ডাইনির রেহাই নেই। পালাবার পথ নেই।

অসাধ্য সাধন এর ক্রিয়া-কলাপ।

কোনো ডাইনি এর ত্রিসীমানায় আসতে পারবে না। গাঁ ছেড়ে পালাবে।

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুবে প্রচার করা হয়েছে।

ডাইনিলোগ, হট যাও। আচ্ছা চাহ্ তো ভাগ যাও।

তীরথ-মার কানে এ খবর পৌঁছে দিয়েছে তার একজন অনুগত।

যেভাবে লোকের হিংসে বেড়ে উঠেছে সনচরির ওপর, আক্রোশ মেটাবার জন্যে, নিশ্চয় আনা হয়েছে এই গুণিনকে।

মিথ্যে অপবাদ দিয়ে সনচরিকে হেনস্থা করা হতে পারে। সনচরির জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। বহুদিন ধরেই সনচরির নামের সঙ্গে একটা বিশেষণ যোগ করা হচ্ছে। 'সনচরি ডাইনি'।

সে নাকি মেয়েদের ঘরের মানুষকে কেড়ে নিচ্ছে, বশীকরণ করছে।

ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-বিবাদ বাধিয়ে দিচ্ছে।

মায়ের কাছ থেকে বাচ্চাদের কেড়ে নিচ্ছে। বাচ্চারা মা-কে মানতে চায় না।

ও গ্রামের অনেকেই মুখিয়া-প্রধানকে অনুরোধ করেছে তাদের বাঁচাতে। এই ডাইনির হাত থেকে রক্ষা করতে।

মুখিয়া অনেক ভেবে-চিন্তে, বুঝে-সুঝে, খোঁজ খবর নিয়ে বড় গুণিনকে এনে হাজির করেছে।

এসেই গুণিন ডাইনি-নিধন যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে।

যজ্ঞে নাকি ডাইনিরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় মরে পড়ে

থাকবে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে নীলাম্বর।

ঘরে পায়চারি করছে—দক্ষিণ থেকে উত্তর। উত্তর থেকে দক্ষিণ।

কোঁচান ধুতির কোঁচাটা মেঝেয় লুটোচ্ছে।

মাঝে মাঝে পকেটে হাত পুরছে। বিষণ্ণ মুখ।

সনচরি বলে উঠেছে, দাদু, আমি তো ডাইনি নয়। ডাইনি বিদ্যার কিছুই জানি না। তোমাদের ভয়ের কোনো কারণই দেখছি না। বলে, একবার নীলাম্বর আর একবার তীরথ-মা-র মুখের দিকে তাকিয়েছে। উত্তরের আশায়।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলেছে নীলাম্বর।

বলেছে, যাই হোক, ও গ্রামে নাই বা গেলে তুমি।

তীরথ-মা নীলাম্বরকে সমর্থন করে বলেছে, আমার তো ঠিক তাই মত দাদা।

পাযে হাত ঠেকিয়ে নীলাম্বর আর তীরথ-মাকে প্রণাম করে, হাসতে হাসতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে সনচরি।

গোরুর গাড়িতে উঠে বসেছে আবার।

ছোট লাঠিটা হাতে নিয়ে দুটো গোরুর পিঠে আলতো মেরে বলেছে, হেট হেট..হেট হেট।

গাড়ি চলছে।

যতটুকু জোর আছে। ততটুকু জোরে।

...দুটো গ্রামকে দু পাশে রেখে মাঝের রাস্তার মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে গাড়ি চলেছে।

সনচরি দাঁড়িয়ে উঠেছে। গানের সুরে গেয়ে গেয়ে ডাকছে বাচ্চাদের।

*বাচ্চা লোগ,*
*সনচরি মাঈ-ই আয়ি তুমলোগোঁ কে লিয়ে*
*পেয়ার করনে কে লিয়ে*
*আও সব বেটা মোরা*
*মিঠা মিঠা লাড্ডু লেনেকে নিয়ে।*

*গানা গানে বোলো গে*
*জরুর গাউঙ্গি*
*তুম লোগোঁ কে লিয়ে*
*বাত্ করনে বোলো গে*

*করঙ্গী তুম লোগোঁ কে লিয়ে।*

পিল পিল করে ছেলের দল যেখানে আছে, সেখান থেকে এক ছুটে চলে এসেছে।

কেউ মানে নি কারও বাধা।

না মায়ের, না বাবার, না পড়শিদের।

কেউ লাফিয়ে উঠছে। কাউকে হাত বাড়িয়ে. দিচ্ছে সনচরি।

সনচরির হাত ধরে ছেলেরা উঠছে।

ছেলেরা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছে—সনচরি মাঈ গানা গাও। ওহি গানা। ঝুটে হ্যায়—সব ঝুটে ঝুটে...।

ছেলেদের মায়েরা ঘোমটার আড়াল থেকে শাশুড়ি ননদকে বলেছে, এ মোরি মাইয়া! দেখে! শুনে! লড়কালোগ কা বাত ক্যায়সি হ্যায়।

উত্তর এসেছে।

আরে রহনে দো। বড়া গুণিন আয়া হ্যায়। ডাইন কো কেয়া হালত হোগি দেখো গে। দেখো গে। থোড়া সবুর কর।

ফরসা চেহারায় গোলাপি ঘাগরা-কুর্তায় সেজেছে সনচরি।

চেহারার জৌলুস আরও বেড়ে উঠেছে।

রাজস্থানী গয়নায় দু হাত ভর্তি। গলায় কানে নাকে মাথায়—কোথাও বাকি নেই। হাতির দাঁতের, সোনার, কাঠের। পায়ে সরু মোটা রুপোর মল।

টানা চোখে টানা কাজল।

জোড়া ভুরুর মধ্যিখানে টিপ।

গোলাপি ওড়না মাথা থেকে ঘাড় বেয়ে উড়ছে চৈতি হাওয়ায়।

সনচরিকে দেখে দেখে দেখার সাধ মিটছে না কারও।

চোখে হাসি। ঠোঁটে হাসি। মুখে হাসি।

মাথার বিনুনিতে মুক্তোর মালা জড়ান।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুরুষের চোখ।

মেয়েরা ভেংচি কাটছে।—আহা হা—কি রূপে কি সাজ! মরি মরি! ওলো সই ধর ধর।

মুখে যাই বলুক, ভেতরটা জ্বলছে। এক চোখো ভগবান! যত রূপ ঐ ডাইনিকে দিয়েছ! ডাইনির সঙ্গে জোরে পারবে না বুঝি! কেন, একটুও কি দিতে নেই আমাদের!

এসব কথা অবশ্য মনে মনেই বলেছে। বাইরের বলার কথা তো নয়।

যে যার আদমির দিকে তাকিয়ে অবাক।

কি বেহায়া! কি বেশরম!

এত রাগারাগি, এত তাপাতাপি, তবু দেখ হ্যাংলার মতো দেখছে সবাই।

আশ্চর্য!

চোখে চোখ পড়তেও চোখ সরাচ্ছে না গা!

গুণিনের কাছে গিয়ে ভালো করে বলে দিতে হবে।

আর একজন হেসে মশকরা করেছে।—দেখিস তোর গুণিন না আবার ডাইনির রূপে হাবুডুবু খেয়ে বসে!

পরের জন হেসে গায়ে ঢলে পড়েছে অন্যের।—তা হলে তো সত্যনাশ। নিজের মাথায় থাপ্পড় মেরে বসে পড়ে আঁ আঁ আঁ চিৎকার করে উঠেছে।

সবাই মিলে তার মাথা ধরে নাড়া দিচ্ছে।—কি হয়েছে! কি হয়েছে!

সনচরি। সনচরি। সনচরি মাথায় থাপ্পড় মেরেছে।

আর মোলো যা! সনচরিকে পেলি আবার কোত্থেকে!

বলতে বলতে গিন্নিবান্নি চেহারার একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজনের ঘাড়ে।

যার গায়ে পড়েছে, সে বলেছে, চোখের মাথা খেয়েছে! যা লাগল দাঁতে! তোমার মাথাটা কি শক্ত! বাব্বা!

গিন্নি মহিলা বলে উঠেছে, সত্যি বলছি রে। আমি পড়ি নি। আমায় কে যেন ঠেলে ফেলে দিলে। মনে হচ্ছে সনচরিই ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

ভয়ে আতঙ্কে যে যার ঘরের দিকে পড়িমরি করে দৌড়েছে।

হোঁচট খাচ্ছে। ইটের ঠোক্করে পায়ের নখ উড়ে যাচ্ছে। এ যেন প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত।

পুরুষেরা কান পেতে শুনছে।—আহা! কি গলা দিয়েছে ভগবান। তাদের বৌয়েদের একটারও এমন গলা নয়।

সনচরি গাইছে—

*ঝুটে জগ কি*
*ঝুটি প্রীত*
*দুনিয়া কা দিল*
*রহেন কা সপনা*
*মোহ নগর মে*
*চ্যায়নকা সপনা*

*রূপ অনরূপ হ্যায়*
*নয়ন কা সপনা*
*কাফি হারে*
*কিসি কি জিত...*

মেয়েরা ঘরের ভেতর দু কানে হাত চাপা দিয়ে বসে আছে।

এ গান শুনলে মরণ সমান।

তাদের বরেরা তো এখনই এ গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে—মিথ্যে। মিথ্যে। সব মিথ্যে। চাওয়া-পাওয়া সব মিথ্যে। কথাটা ধ্রুব সত্য। কজন এটা বুঝতে পারে। কজন এই কথার মর্ম বুঝে সব জিততে পারে! সত্যিই সব মিথ্যে।

পারে না। পারে না। পারে না।

হারই হয় বেশির ভাগের।

জিত ক জনের ভাগ্যে!

বোধহয় এক আধজন।

সনচরি এ গানটা পেল কোত্থেকে!

গান শুনতে শুনতে গুণিন অগ্নিদেবের চেলা বীরদেব আছড়ে পড়ল সটান মাটিতে।

কি হলো! কি হলো! চিৎকার। ছুটে এসেছে সবাই।

বীরদেওর মাথায় ঘুষি মেরেছে সনচরি।

অগ্নিদেবের খুব লম্ফঝম্ফ। গাঁজার কলকেয় টান দিতে দিতে লাফাচ্ছে।—মারেঙ্গে। কাটেঙ্গে। দেখেঙ্গে।

মাটি থেকে মুঠো মুঠো ঘাস ছিঁড়ছে আর বিড় বিড় করে কি মুখে বলছে বোঝা যাচ্ছে না। বাতাসে ছুড়ে ছুড়ে মারছে সনচরির উদ্দেশ্যে।

বাচ্চাদের মায়েরা ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে।

কেঁদে আছড়ে পড়েছে অগ্নিদেবের পায়ে।—রক্ষা কর বাবা। রক্ষা কর। বাচ্চাদের বাঁচাও।

সনচরির সঙ্গে গাড়িতে রয়েছে ছেলেরা। সনচরির কিছু হলে ছেলেরা বিপদে পড়তে পারে। আঘাত লাগতে পারে ওদেরও গায়ে।

খানিক পরে সনচরি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে ঘুরে এসেছে ফেরার পথে।

আগের জায়গায় আবার দাঁড়িয়েছে গাড়ি।

সনচরিকে ছেলেরা জড়িয়ে ধরছে। চুমু খাচ্ছে।

যাবে না মায়ের কাছে।

সনচরি ছেলেমেয়েদের গায়ে মাথায় চুমু খেয়ে পিঠ চাপড়ে বলছে, মায়ের কাছে যাও বাবা। কাল আবার আসব।

হাসতে হাসতে এসেছে যেমন সনচরি। হাসতে হাসতেই ফিরে যাচ্ছে।

যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। বুকে তুলে নিয়েছে ময়ূরটাকে।

পেছন ফিরে দেখছে আর হাত নাড়ছে। বাচ্চারাও হাত নাড়ছে।

আওগে! জরুর আওগে সনচরি মাঈ।

বাড়িতে ফিরে আসতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তীরথ-মা। নীলাম্বর।

কাতর কণ্ঠে নীলাম্বর বলেছে, সনচরি, গোঁয়ার্তুমি অনেক সময় বিপদে ফেলে মানুষকে। তোমাকে আর কিছু বলার নেই আমার। এতক্ষণ ধরে বুকের ভেতর যে কি যন্ত্রণা, তোমাকে বোঝাতে পারব না।



সন্ধের মুখোমুখি।

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী।

অগ্নিদেব কাঠের আগুন জ্বালিয়ে কি সব ধ্যান করেছে। মন্ত্র আওড়েছে।

তারপর বলেছে, ঐ আগুনের মধ্যে শাড়িপরা একটা মেয়ে পুতুলকে ফেলে দিয়ে, সনচরির হিম্মত, মায়াজাল সব ছাই হয়ে যাবে। শেষ অবধি সনচরি বাঁচবে কি না সন্দেহ।

দাউ দাউ আগুনের শিখা নিভে গেছে একদম।

কেবল কাঠের গায়ে শাদা ছাইয়ের ভেতর দিকে উঁকি মারছে কিছু কিছু লাল আগুন।

উঠে দাঁড়িয়েছে অগ্নিদেব।

মেঝেয় লুটোনো জটা। সযত্নে তুলে ধরেছে চেলা বীরদেব।

গুরুজির পেছু পেছু চলেছে সেও।

এই পোড়া কাঠের ওপর দিয়ে খালি পায়ে মাড়িয়ে যাবে অগ্নিদেব। সনচরির হাড়-পাঁজরা চূর্ণ করে দেবে।

পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠেছে অগ্নিদেব। বুক কাঁপান হাসি।

পোড়া কাঠের ওপর পা তুলতে যাচ্ছে।

ধরমিয়া এসে আটকেছে।—নেহি নেহি নেহি। দোহাই অগ্নিদেবজি। সনচরিকে মারবেন না। এটুকু কৃপা করুন।

আমি চাই ওর মনটাকে ঘুরিয়ে দিন। আর কিচ্ছু চাই না। সুদামের ওপর থেকে ওর মন যেন সরে যায়। সুদামও যেন ভুলে যায় ওকে।

হেসে উঠেছে সুদাম। পাগলি কোথাকার!

পা তুলতে গিয়েও আর তোলে নি অগ্নিদেব। ফিরে এসেছে।

মাটির গামলা ভর্তি জল।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাটকাঠিতে আগুন জ্বেলে জলে ফেলেছে।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে জলে।

গুঞ্জন উঠেছে চতুর্দিকে—জলে যজ্ঞ! জলে যজ্ঞ! কি শক্তিধর! অগ্নিদেবের মহাশক্তি।

মুখিয়ার মুখে হাসি। প্রশংসার সবটুকু যেন তার একারই।

দেহরক্ষার.জন্যে পাছে ভূত প্রেত এসে না যজ্ঞ পণ্ড করে, না বিব্রত করে তোলে অগ্নিদেবকে, সে জন্যে চারজন চেলাকে চার কোণে বসান হয়েছে।

পর পর এক এক কোণের চেলা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।—সনচরি।

দ্বিতীয় জন তৃতীয় জন চতুর্থ জন।

সনচরি। সনচরি। সনচরি।

ওরা নাকি দেখেছে।

এক এক জনের ঘাড় ধরে ফেলে দিয়েছে। মাটিতে মুখ গুঁজরে পড়ে রয়েছে ওরা।

কমণ্ডুল ডুবিয়েছে আগুনজ্বলা জলে অগ্নিদেব।

কমণ্ডুলের জল ছিটিয়েছে এক একজনের মাথায়।

উঠে বসেছে একে একে। বলেছে এক এক করে।

কি ভীষণ দৃশ্য!

সনচরি মায়াবিনী।

মায়াবিনী প্রকৃত ডাইনি।

বড় বড় দাঁত। রুক্ষ চুল। হাড় জিরজিরে চেহারা। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। দেখলেই বুকের রক্ত জল হয়ে আসে।

কি বরফ ঠাণ্ডা হাত! যা দেখা যায় সেটা সনচরির মায়ার রূপ। ওরা আসল চেহারা দেখেছে।

তবে একটা শুভ লক্ষণ অগ্নিদেবের ক্রিয়া-কলাপে সনচরি কাহিল। বেশিক্ষণ থাকতে পারে নি। দ্রুত পালাতে পথ পায় নি।

চারজনই চিৎকার করে বলে উঠেছে একসঙ্গে—নিপাত যাক। নিপাত যাক সনচরি ডাইনি।

ধরমিয়া ছাড়া সমস্ত মেয়েরাও একসঙ্গে বলে উঠেছে রাক্ষুসি ডাইনি সনচরি! আজ রাতেই যেন মরে পড়ে থাকে পুতনা রাক্ষুসির মতো।

অগ্নিদেব দয়া কর।

পরের সকাল।

ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

গাছে গাছে দোল।

ফুলে ফুলে মিতালি।

গাঁয়ের মেঠো গন্ধ। আর ফুলের সুবাস।

মিলেমিশে একটা নতুন আস্বাদ।

ফিরোজা রঙের সাজে সেজেছে সনচরি। রাজস্থানী সাজ।

এদেশের মেয়ে না হয়েও সনচরি এদেশের মেয়ে হয়ে গেছে।

ছ বছর বয়েসে এসেছে মায়ের সঙ্গে।

যেমন দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, নেচে-গেয়ে দড়ির খেলা দেখায়, এখানেও সেইভাবে এসেছে, মা-বাবার সঙ্গে।

মা সনচরি নাম রেখেছিল বুকে অনেক আশা নিয়ে।

রাজস্থানে এক সময় সত্যি সত্যি সনচরি একজন ছিল। পাহাড়ের চুড়োয় চুড়োয় দড়ি বেঁধে আশ্চর্য রকমের খেলা দেখাত সে। সে জাদুকরি সনচরি নামে বিখ্যাত। তাই মা-ও মেয়েকে বিখ্যাত করতে চেয়েছে।

রাজা সনচরির খেলায় এত মুগ্ধ, অত উঁচুতে—এ পাহাড়ের চুড়ো থেকে ও পাহাড়ের চুড়োয় দড়ির ওপর দিয়ে অনায়াসে হাওয়ায় ভেসে ভেসে চলে যেতে দেখে।

কেমন করে হয় এত সাহস?

জাদুকরি সনচরি কি কোনো মন্ত্রবলে যায় ভেসে—দূর থেকে দূরে!

উঁচু থেকে উঁচুতে!

অসম্ভব ব্যাপার।

অনেক চেষ্টা করেও, অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করেও কোনো কিছুর হদিশ পায় নি রাজা।

খেলা দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে রাজা।

সনচরির কথাই তার শিরোধার্য।

সনচরির রায়ই মোক্ষম রায়।

হালচাল দেখেশুনে রানি মন্ত্রির সঙ্গে অনেক শলা-পরামর্শ করেছে। কি করে রাজার চোখের এই মোহময়ী নারীকে সরান যায় চোখের বাইরে!

কেউ ভাবতে পারে নি রানি এইভাবে হিংসা চরিতার্থ করতে পারবে।

কি সাংঘাতিক ঘটনা। কি করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য।

পাহাড়ের চুড়ো থেকে দড়ি বেয়ে মাঝ বরাবর এসেছে। এসব সময় ভয়ঙ্কর মৃত্যুগহ্বরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে রানি। মন্ত্রি লোক দিয়ে দড়ি কাটিয়ে দিয়েছে।

মাটির বুকে আছড়ে পড়েছে সনচরি।

মাটির মেয়ে মায়ের সঙ্গে মিশে গেছে।

যেখানে নির্দয়ের নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে সনচরির ওপর, সেই জায়গায়—পাহাড়ের গায়ে রাজা লোক দিয়ে লিখিয়ে দিয়েছে—সনচরি।

সনচরি দেহে নেই।

নামে বেঁচে আছে আজও।

বেঁচে থাকবেও।

বেঁচে থাকুক।

এতো গেল ইতিহাসের কথা।

কিন্তু আমাদের এই সনচরি! বর্তমানের মধুবনির?

মা ভেবে আকুল হয়েছে।

মরতে কেন এ নাম রেখেছে!

নামের সঙ্গে জীবনের ঘটনাও কি প্রত্যক্ষ মিলে যায়?

সনচরির জীবনে তো মিলে গেছে।

দশেরা উৎসবের দিনে খেলা দেখানর সময় ওরও তো দড়ি কেটে দেয়া হয়েছে।

সে যাত্রা সুদাম না থাকলে ওরও জীবনলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

ষড়যন্ত্রের কথা শুনে ধরমিয়া চুপ করে বসে থাকতে পারে নি। যথেষ্ট অনুরোধ উপরোধ করেছে অগ্নিদেবকে—দড়ি কাটার কাজ থেকে নিরস্ত হতে।

অগ্নিদেব মুখে হেসেছে। কিন্তু মনে আঁক কষেছে।

সনচরিকে শেষ করতেই হবে। সকলের কাছে গুরুত্ব বাড়বে তার। যশবৃদ্ধি হবে আরও। কৃতিত্বের গৌরব ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

অগ্নিদেবের হাসি দেখে হাসি আসে নি ধরমিয়ার। বুকটার ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে। কান্না। কান্না।

ভেতর কেঁদে উঠেছে। বাইরে চোখে জল ঝরেছে।

তার মন বলেছে, বিশ্বাস কোর না। কোর না। কোর না।

সুদামকে বলেছে দু হাত ধরে, তুমিই একমাত্র সনচরিকে বাঁচাতে পার।

খেলা দেখানর সময় তোমাকে যেতে হবে। দড়ির ওপর দিয়ে ওর চলার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও চলতে হবে। ও দড়িতে। তুমি মাটিতে। একটুও তফাৎ যেন না হয়, তা হলে সর্বনাশ। ও পড়ার মুখেই তোমাকে ধরে ফেলতে হবে। এতটুকু

অসাবধান হলে চলবে না। খুব হুঁশিয়ার।

কাতর স্বরে ধরমিয়া বলেছে, তুমি কেন চুপ করে রয়েছ গো! আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছ না! কি এত দেখছ আমার চোখে মুখে! কি নতুনত্ব!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুদাম বলেছে, কোন ধরমিয়াকে আমি দেখছি! সনচরির কাছে আমায় বিশ্বাস করে তুমি পাঠাতে পারছ! পারবে!

ধরমিয়ার চোখে দিশেহারা। কি করবে। কাকে বিশ্বাস করে পাঠাবে।

এ কথা জানাজানি কানাকানি হলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে গাঁয়ে।

ধরমিয়াদের টেকা দায় হয়ে দাঁড়াবে।

বেশির ভাগ অনুরোধটা ধরমিয়ার দিক থেকে এসেছে মুখিয়ার কাছে।

সনচরির ওপর সন্দেহ। সুদামকে কেড়ে নেবে।

তার কথাতেই এ গ্রামের মেয়েদের উত্তেজনা। এবং ধরমিয়ার ওপর সহানুভূতি।

ঘেন্না ক্রোধ সনচরির ওপর। এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! এ যে সেই ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবাক সুদাম।

ধরমিয়া বলেছে, বিশ্বাস কর তুমি কারও হয়ে যাও, এটা আমি চাই না। কিন্তু তা বলে সনচরি শেষ হয়ে যাক, এটাও তেমনি আমি চাই না।

সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

কথা দাও। শপথ কর। যাবে!

দু চোখ দেখছে। ভালো করে দেখছে সুদাম।

ধরমিয়ার ভেতরটা যাচাই-বাছাই করছে বুঝি।

হ্যাঁ, একটা নরম বস্তু আছে। সেটা ভালোবাসা। সেটা কৃতজ্ঞতা।

জলে ডোবা ছেলেকে মা-কে একসঙ্গে বাঁচিয়েছে সনচরি। একথা ধরমিয়া বার বার শোনায় সুদামকে।

সুদাম যাবে। প্রাণপণ চেষ্টা করবে সনচরিকে বাঁচাবার। কোনো ত্রুটি হবে না।

ধরমিয়ার হাত ধরে বলেছে, আমাকে বিশ্বাস করতে পার। কথা দিচ্ছি, দেবতাদের কসম। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পার। কিন্তু বলে রাখছি, পরের ঘটনাটা তোমাকে সহ্য করতে হবে।

জোড়হাত করে ওপর দিকে তাকিয়ে ধরমিয়া বলেছে, আমাকে শক্তি দিও। আর কিছু বলতে পারে নি। গলা ধরে এসেছে। দু চোখে হাত চাপা দিয়ে সুদামের সামনে থেকে দৌড়ে চলে গেছে?

সনচরি বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

বাঁশির আওয়াজে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে ধরমিয়া।

ওকে বলা দরকার। ওকে সাবধান করা দরকার। ওর বিরুদ্ধে আবার ষড়যন্ত্র।

একবার বাঁশিতে গানের সুর তুলছে সনচরি। পর পরই ঠোঁট থেকে বাঁশি সরিয়ে নিয়ে নিজের গলায় গাইছে গলা ছেড়ে। গলা নয়ত, এ যেন দ্বিতীয় বাঁশি। ভুল হয় শুনতে। ভুল হয় বুঝতে।

সনচরি গাইতে গাইতে গোরুর গাড়ি চালিয়ে ধরমিয়াদের দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমে।

*ধোকা হ্যায় সংসারোঁ মে ধোকা*
*নর মে ধোকা নারী মে ধোকা*
*প্রেম মে ধোকা পেয়ার মে ধোকা*
*ফিকি তানে বেরস গীত....*

গাড়ি থামতেই ধরমিয়া কাছে এসে বলেছে, সনচরিরে! কবে মরণটা হবে বলতে পারিস!

সনচরি জিভ কেটে বলেছে, ও কথা মুখে আনিস না। বরং বল, তোর আগে যেন আমি মরি! এত ভালোবাসা আর পাব কার কাছে বল!

শোন, ঠাট্টা-তামাশা এখন রাখ। জরুরী বাত কান দিয়ে মন দিয়ে শোন।

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে ধরমিয়া, এ গানটা এখানে গাস নি। দোহাই তোর। গাঁয়ের লোকেদের মাথায় ঢুকেছে যত মরদ আছে, যত ছেলে-মেয়ে আছে—সবাইকে তুই মুঠোয় পুরে রাখতে চাস। কুঁড়ে করে দিতে চাস। অকর্মণ্য করে দিতে চাস। এটা গ্রামের সর্বনাশ।

এখনই ছেলে-বুড়ো—কেউ আর কোনো কাজকর্ম করতে চাইছে না।

করতে বললেই বলে উঠছে, কি হবে! সবই তো ঝুটা ঝুটা ঝুটা।

মুখিয়া অগ্নিদেব—সকলেরই এক মত—তুই গ্রামের সর্বনাশ। আমার ভয় ধরে রে সনচরি। তুই আর আসিস না।

বলতে গিয়ে ওড়নায় চোখ ঢেকেছে ধরমিয়া।

সনচরিরও চোখে জল।

আস্তে আস্তে বলেছে, না এলে তুই সুখি তো!

ঘাড় নেড়েছে ধরমিয়া। —না না না।

সনচরির বুকে হাত বুলিয়ে বলেছে, বহিন, তুম জিন্দা রহ।

সনচরি গাড়ির মুখ ঘোরাবে কি না ভাবছে। ইতস্তত করছে।

ঘোরাতে হলো না আর। ফেরাতেও হলো না।

তার স্নেহের ছেলের দল এর মধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়েছে গাড়িতে। সনচরি মাঈ, গানা গাও। গানা গাও। হমলোগ কো ঘুমাও। লাড্ডু দেও। লাড্ডু দেও।

ধরমিয়া চোখের ইশারায় লাড্ডুর ঝুড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, আর আনিস নে। লাড্ডুতে কি জাদুটোনা করিস সবাইকে বশ করার জন্যে?

ছেলেরা-মেয়েরা চিৎকার করে উঠেছে, হ্যাঁ আনবে হ্যাঁ আনবে। আমরা খাব।

ধরমিয়াকে ধাক্কাধাক্কি। বকাবকি। হুলুস্থূল।

ধরমিয়ার ওপর সব ছেলেমেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বটগাছের ঝুড়িটা ধরে না ফেললে ধরমিয়া কুপোকাৎ।

সনচরি গাইছে আর বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশি বাজাচ্ছে আর গাইছে।

বনশি বাজায়ো শ্যাম চলে যায়
ঠারি রহি ম্যায় তো
আপনি অটারিয়া
হৃদয় মে বড়ছি চুভায়ে লিয়ে যায়
অ্যায়সা বেদরদি দরদিয়োঁ না জানে
মেরে ছোটে সে দিল কো
চুরায়ে লিয়ে যায়
না মানে কাহানা এ দোনো নয়না
রহা রহা কে উন পর নজর চলে যায়...

সই বাঁশি বাজিয়ে ঐ শ্যাম চলে যায়
আমারই আঙিনা দিয়ে লুকিয়ে পালায়
দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকি চেয়ে চেয়ে তারে দেখি
সে নিঠুর শ্যাম কভু ফিরে না তাকায়

না বুঝে মরম ব্যথা না শোনে কোনো কথা
পাষাণে সঁপেছি প্রাণ কি হবে উপায়
জানে কত ছলাকলা আমায় নিয়ে হেলাফেলা
*এত অবহেলা সয়ে মন ছুটে যায় শ্যামের দুটি রাঙা পায়...।*

গানের সঙ্গে সুর বেসুর সবই চলছে বাচ্চাদের গলায়।

মাঝে মাঝে আনন্দে বাচ্চারা লাড্ডুর-ঝুড়ি থেকে লাড্ডু তুলছে। আর গালে পুরছে। আর বলছে, জাদু কিয়া সনচরি মাঈয়া। সনচরি মাঈকি জয়।

বাতাসে ভেসে আসছে।

এ গাঁয়ের সব পুরুষরা দেখছে। অগ্নিদেব দেখছে।

অগ্নিদেব তার চেলাদের জিগ্যেস করছে—এ ক্যায়সি ডাইন হো! মরণে কা বখত ভি জিন্দা হো জাতি হ্যায়।

কাল তোরা দেখলি তো সব। ক্রিয়াকলাপে ওকে মেরে ফেলা হলো। তবু ডাইনি বেঁচে এসেছে দেখছি। ডাইনি নিধন মহাযজ্ঞ করা হয়েছে কাল। শেষ যজ্ঞ। ইয়ে তো তাজ্জব কি বাত।

চেলাদের একজন বলে উঠেছে, গুরুজি, ইয়ে মহা ডাইন হ্যায়। ডাইন বিদ্যা মে লিখি হ্যায়। কোনো ডাইনি যদি সাতজন্ম ধরে ডাইনি সাধনা করে যায়, সে ডাইনির ওপর কোনো ক্রিয়া-কলাপ খাটে না। সে অমর। সে সাক্ষাৎ রাক্কুসি। তাকে সরাতে গেলে অন্য ভাবে চেষ্টা করতে হবে।

কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ধরমিয়া আর তার বান্ধবীরা যেন অন্য রাজত্বে চলে গেছে। ওরা নিজের অজানতেই গাইতে শুরু করে দিয়েছে—

*বনশি বাজায়ো শ্যাম চলে যায়*
*সনচরি মাঈয়া জাদু কিয়া। সনচরি কি জয়।*

অগ্নিদেব, মুখিয়া কানে ফিস ফিস করে কথা বলেছে দুজনে।—এসব কী ব্যাপার ঘটছে! এ কী ধরনের জাদু! চলে গেলেও রেশ থেকে যাচ্ছে।

মেয়েরা বিপক্ষে ছিল।

মেয়েরাও তো ওর বশে চলে যাচ্ছে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে অগ্নিদেব বলেছে—হুঁ—ভালো করে দেখতে হবে আমায়। ছাড়লে চলবে না। ডাইনির পা থেকে মাথা অব্দি কি ধাতুতে গড়া।

ইচ্ছে থাকলে চেষ্টা থাকলে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। কথাটা খাঁটি। যদিও অগ্নিদেবকে মাস তিনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে আর ডাইনির আসা-যাওয়া, উৎপাত সহ্য করতে হয়েছে।

সনচরির আসা বন্ধ হয় নি।

শ্রাবণের আকাশ মাটি ঝিরঝিরে বৃষ্টির সুরে সুরে কাজরি গান মুখর হয়ে উঠেছে।

পুরুষদের গানের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ।

মেয়েদের মেলা। মেয়েদের খেলা। মেয়েদের নাচগান।

*আয়ে শাওন কে মাহিনা*
*ঝুলে কৃষ্ণ মুরারি না*

কদম গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় বসে চোখ বুজে গাইছে সুন্দরী সনচরি। মেঘলা দিনে সবুজ রঙ খোলে ভালো।

কদম গাছের ডালে দোলনার দড়ি বাঁধা। দড়িতে ফুলের মালা জড়ান।

দু হাতের মুঠোয় দু পাশের দড়ি।

দুলতে দুলতে গাইছে সনচরি।

গাইছে কাজরি গান।

*আয়ে শাওন কে মাহিনা*
*ঝুলে কৃষ্ণ মুরারি না...*

দূর থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে বড় চোখে তাকিয়ে দেখছে অগ্নিদেব।

দেখতে দেখতে আর গান শুনতে শুনতে নিজের অজানতেই কখন সনচরির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা খেয়াল নেই।

সনচরির মাথার দিকে দেখেই চমকে উঠেছে।

একটা সাপ ফণা তুলে দুলছে সনচরির সঙ্গে সঙ্গে।

পা দুটো মাটিতে আটকে গেছে অগ্নিদেবের।

এ কি দৃশ্য!

মনসাদেবী, না ডাইনি!

কি দেখছে সে! সত্যি না মিথ্যে।

লোক মুখে শোনা ডাইনির ইন্দ্রজাল-মোহজাল।

এটা কি তাই!

দুচোখ রগড়ে ভালো করে দেখার মুখে সাপটা লাফিয়ে পড়েছে অগ্নিদেবের ঘাড়ের ওপর।

হাতের ঝটকায় মাটিতে ছিটকে পড়ে সজোরে তেড়ে এসে পায়ে দাঁত, বসিয়ে দিয়েছে। বিষদাঁত।

বিপদে নিয়ম নাস্তি।

ছেলেমেয়েরা সবাই এসে হাজির। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কি করবে কি করবে! ওঝাকে ডাকো।

কোথায় পাবে!

এই সব কলরবে তাণ্ডব নাচন বাতাসে।

কোনো দ্বিধা না করেই দোলা থেকে লাফিয়ে পড়েছে সনচরি।

নিজের ওড়না ছিড়ে ছিড়ে তাগা বেঁধেছে পরপর।

তারপর নিজের জীবন বিপন্ন করে দাঁত বসানর জায়গায় মুখ লাগিয়ে টেনেছে

বিষ।

টানছে টানছে। ফেলছে।

টানছে টানছে। ফেলছে।

এবার তাজা রক্ত বেরচ্ছে।

হতভম্ব হতবাক অগ্নিদেব।

কে এ! কোথায় সে! সবই কি সত্যি? না মিথ্যে! না কি যমদূতের দাঁত দেখা যাচ্ছে!

সত্যি।

কে এ! সনচরি! ডাইনি!

না না।

একমাত্র মা-ই নিজের জীবন বিপন্ন করে যে কোনো বিপদ থেকে ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

একি মাতৃমূর্তি দেখছে সে!

বিশ্বের সমস্ত মমতা এক জায়গায় এসে ঝরে পড়েছে। সনচরির চোখে-মুখে বুকে।

তাই না!

হলফ করে কেউ বলতে পারে এটা সত্যি নয়!

পারবে না। পারবে না। পারবে না।

সনচরির ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা-রটনা—সব মিথ্যে।

সনচরি ডাইনি নয়। সনচরি দেবী।

এরপর গ্রামে উল্টো উজান বইতে শুরু করে দিয়েছে।

ভূতের মুখে রাম নাম।

অগ্নিদেব প্রত্যেককে ডেকে ডেকে বলছে, সনচরি ডাইন নয়। মিথ্যে ধারণা।

চেলারা অবাক।

চেলারা রটনা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, পাষাণি সনচরি গুরুদেবের সব শক্তি হরণ করে নিয়েছে। যে কোনো উপায়ে ঐ পিশাচিনী ডাইনিকে শাস্তি দিতে হবেই হবে।



বাড়ির গেটে প্রবেশ করার আগেই সনচরি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে এখন আর ওদিকটায় যাবে না। ধরমিয়ার কাতর অনুরোধ রাখবে।

ভেতরে ঢুকে নীলাম্বর দাদুর ঘরে গিয়েই অবাক।

একি! কথায় কপালে এক!

তীরথ-মা মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে পাশের চেয়ারে বসে। জ্বর।

সনচরি আর একটা চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসে পড়েছে। মাথায় হাত।

ভালো দেখে বেরিয়েছে।

এসে একি দেখছে! হঠাৎ এরকম হলো কেন!

তীরথ-মা ইশারা করেছে পাশের ঘরে যেতে।

এসেছে সনচরি।

এসেছে তীরথ-মা-ও।

চাপা গলায় বলেছে, মনটা ভালো নেই। আজ বৌদির মৃত্যু দিন। দাদা অনেকক্ষণ ধরে বৌদির পোঁতা কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছে। তারপর ওখানে বেঞ্চিতে বসে তোকে খুঁজেছে খালি।—সনচরি কোথায়! কই, এখনও তো আসছে না! আর আসবে না বোধহয় তীরথ-মা।

তীরথ-মা, কি বিভীষিকা। কি তাণ্ডব!

শেয়াল শকুন চতুর্দিকে। খালি মড়া মড়া আর মড়া। দেখতে পারা যায় না।

দুচোখ বুজে হাঁপাচ্ছে নীলাম্বর।

দাদা দাদা দাদা!

দু কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলছে তীরথ-মা। আর বলছে, কী সব বলছ তুমি!

চোখ খুলে বলেছে নীলাম্বর, আমি কোথায়! শ্মশানে!

সে কি দাদা! তুমি তোমার বাড়িতে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেছে আবার তীরথ-মা, তুমি তোমার বাড়িতে। তুমি তোমার বাড়িতে। তুমি তোমার বাড়িতে।

জ্বর এসেছে। গা পুড়ে যাচ্ছে।

দারোয়ানকে ডেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলেছে।

তারপর থেকে এই অবস্থা। মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে, স্বর্ণশিখা, বিধুরেখা—মনোশোভা—তোরা কে কোথায়! সনচরি গেল কোথায়!

সনচরি। সনচরি। সনচরি! শিগগির ওকে ধরে নিয়ে আয়। আমার সঙ্গে শেষ দেখা আর হলো না।

তীরথ-মা, বুকের যন্ত্রণাটা বড্ড বেড়ে উঠছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছে তীরথ-মা।

সনচরি, তোর জিদটা একটু ভাঙ। মানুষটা চলে গেলে যা খুশি করিস। কেউ আর এমন করে খুঁজবে না। এমন করে বলবে না। কটা দিনই বা আর আছে! প্রায়ই তো এই অবস্থা। জ্বর নয় বুকের যন্ত্রণা।

চিবুক ধরে পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বলেছে সনচরিকে। —লক্ষ্মী মা আমার! একটু বোঝ। তুই কাছে থাকলে কত খুশি। দশগুণ পরমায়ু বেড়ে যায় বুঝি। তোর হাত বুকে পড়লে ব্যথা কোথায় পালিয়ে যায়। এটা বুঝিস না কেন!

পাশের ঘর থেকে নীলাম্বরের চিৎকার ভেসে আসছে—সনচরি সনচরি সনচরি।

সনচরি এসেছে!

সনচরি দৌড়ে গিয়ে বুকের ওপর পড়েছে নীলাম্বরের। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

উঠে বসেছে। বুকে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কে-এ-কে!

আমি দাদু। আমি সনচরি।

তাই তো বলি, এ হাত আর কার হবে!

দু হাত দিয়ে সনচরির হাতখানা বুকে চেপে ধরেছে জোর করে।

চোখ খুলে তাকিয়েছে মুখের দিকে।—তোর কষ্ট হচ্ছে, না!

না দাদু। কোনো কষ্ট হয় নি। তোমার ব্যথা কমেছে?

হ্যাঁ। সব কমেছে। জ্বর ব্যথা—সব। তুই কাছে থাকলে এসব তো কিছু হয় না রে। চলে গেলেই যত অনাসৃষ্টি।

হাঁপাচ্ছে নীলাম্বর।

চুপ কর দাদু। বেশি কথা ক'য়ো না আর। কষ্ট হবে।

যাব না। তোমাকে ছেড়ে আর আমি যাব না।

উঠতে চেষ্টা করছে নীলাম্বর। —আমায় তোল। ধরে তোল।

দুপাশ থেকে দুজনে ধরে তুলেছে নীলাম্বরকে, সনচরি আর তীরথ-মা।

মুখ ভরা হাসি নীলাম্বরের।

সত্যি যাবি না?

হ্যাঁ দাদু। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। যাব না।

সনচরি, কি যে কষ্ট! কাকে জানাব! তোকে আর কি বলব! বেরবার সময় থেকে আরম্ভ। না ফেরা পর্যন্ত যম-যাতনা। সময় সময় মনে হয়, প্রাণটা বুঝি বেরিয়ে যাবে এবার। খালি মনে হয়, ওরা তোকে মেরে ফেলবার তোড়জোড় করছে। কেন জানি না অলুক্ষুণে ঘটনা সব চোখের সামনে ভেসে আসে। তোকে সবাই মিলে আটকে ফেলেছে। আসতে দিচ্ছে না। বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছিস না তুই। চিৎকার করে ডাকছিস—দাদু দাদু দাদু!

সনচরি নীলাম্বরকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে ধরা গলায় বলেছে, এত ভাব, এত ভালোবাসা, আমি কি এর যোগ্য! দাদু, এত অস্থির হয়ো না।

সত্যি কথাই তো। আজ যদি নীলাম্বর দাদুর কাছে না এসে পড়ত, তাহলে জীবনে এরকম স্নেহ-মমতার সন্ধান পেত কি সনচরি?

-কখনই নয়। কখনই নয়।

পথে পথে ঘোরা খেলা দেখান গান গাওয়া আর নাচ—এই জীবন নিয়েই তো মায়ের মতো এসেছে এই দুনিয়ায় সনচরি।

বিধাতার চক্র কী ভাবে ঘুরে গেছে এখানে আসতে।

এখানেও এসেছে সেই রাজস্থানী যাযাবরীর জীবন নিয়ে পাশা খেলতে।

যা ভাবা যায় না, কল্পনা করা যায় না, স্বপ্নেও দেখা যায় না—তাই ঘটেছে সনচরিদের জীবনে।

মায়ের গানে নীলাম্বর দাদুর মেয়ে—বিধুরেখামাসির পূর্বস্মৃতি একটু আলোর রেখা হয়ে ভেসে এসেছে বোধহয়।

মাসি জড়িয়ে ধরেছে মা-কে। যেতে দেব না। গান শেখাও আমাকে। এ গান আমি ওস্তাদজির মুখেও শুনেছি। —নাথ গজবন্ধ কো ছুড়াও...

আকাশের মতো মন নীলাম্বর দাদুর।

নিজের সব কিছু সবাইকে বিলিয়ে দিয়ে শান্তি বুঝি।

তীরথ-মা-র আশ্রয় যেমন, সনচরিদেরও তেমনি আশ্রয় নীলাম্বর দাদু। মাকে বলেছে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াও গান গাইতে যাও আপত্তি নেই। আমার এখানে—এ বাড়িতে তোমাদের চিরদিনের বাস জানবে। তুমি আমার মেয়ের মহা-ওষুধ।

তারপর পাগলা মোষের সামনে এগিয়ে গিয়ে দু বছরের দুঃসাহসী সনচরি গতি

থামিয়ে দিয়েছে। সে যাত্রা অতটুকু মেয়েই নীলাম্বর দাদুর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

সনচরি এখানে নীলাম্বর দাদুর প্রাণেরও প্রাণ।

তীরথ-মা ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে বলেছে একদিন—এখন সনচরি বেশ বড় হয়ে গেছে, ষোল কি সতের, দাদা, নাতনির বিয়ের ব্যবস্থা হোক এবার।

বিয়ে! আঁতকে উঠেছে নীলাম্বর।

তুমি জেনে শুনে একথা বলছ কেমন করে তীরথ-মা!

সনচরি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, না না। আমি বিয়ে করব না।

এক গাল হাসি নীলাম্বর দাদুর।

কেন? কেন করবি না?

কাকে করব দাদু! পুরুষ দেখলেই মনে হয় বাচ্চা।

আশ্চর্য হয়ে গেছে নীলাম্বর দাদু।—বলিস কি রে! এ যে জোড়াসাঁকোর দেবীশক্তি মায়ের কথার মতো কথা। ওঁদের বাবা যখন বিয়ের চেষ্টা করেছে, দেবীশক্তি মা বলেছে, কেন চেষ্টা করছ! বর কোথা পাবে! সকলেই তো আমার ছেলে।

সনচরি, তুই নিজের ভেতরটাকে ভালো করে চিনতে চেষ্টা কর। তুই কে।

নীলাম্বর দাদুর কাছে আর তীরথ-মায়ের কাছে সনচরির শিক্ষাদীক্ষা আর জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ।

একথা সনচরি নিজ মুখে স্বীকার করলেও নীলাম্বর, তীরথ-মা অন্য কথা বলে।

বলে, সনচরি, নিজের মধ্যে কিছু না ভালো গুণ থাকলে কি কাউকে শিখিয়ে-পড়িয়ে কিছু করা যায়! সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।

সনচরি একা বসে বসে ভাবে, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের দুখে দুখি হওয়া—এটা কি ভালো গুণের মধ্যে পড়ে! যদি পড়ে তবে কেন তাকে রাক্কুসি, ডাইনি বলা হয়! এটা কি অপরাধ!

যদি অপরাধ না হয়, তবে কেন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে মানুষ। তাকে ভালো লেগে যদি কেউ ভালোবাসে, কাছে ছুটে আসে, যেমন বাচ্চারা আসে, এটা কি সনচরির অপরাধ?

যদি অপরাধ না হয়, তবে কেন বলা হচ্ছে, সনচরি মায়াবিনী, সনচরি বশীকরণ করে, সনচরি সবাইকে নিজের তাঁবেদার করে রাখতে চায়!

সনচরি থেকে তফাৎ থাক সকলে।

সনচরির হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা কর সবাই।

হ্যাঁ, এটা সত্যি। সনচরি বাচ্চাদের বেশি ভালোবাসে।

কারণ, এরাই তো দেশের আলো। এরাই তো দেশের উন্নতি। এরাই তো দেশের মঙ্গল। এরাই আনন্দ। এরাই শান্তি। এরাই মিলন। এরাই ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎকে ভালো ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছে সনচরি। এটা অপরাধ?

কেন মানুষ বোঝে না! কেন সত্যিকে অস্বীকার করে? কেন নিজেকে গোপন করে রাখতে চায়? যা সে নয়, সেটাই লোকের কাছে বড় করে দেখাতে বলতে চেষ্টা করে।

নীলাম্বর দাদুর কাছে এসব প্রশ্নের উত্তর চেয়েছে সনচরি বার বার।

বার বার একই উত্তর পেয়েছে।

যতদিন মানুষের মনের কোণে হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনের কণামাত্র থাকবে, যতদিন লোভ-ক্রোধের, যতদিন স্বার্থ-লোভের, ততদিন মানুষ সত্যকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করবে।

আগুনের একটু কণাও যদি থেকে থাকে কারও মনে, সে আগুন সময়ে দাবানল হয়ে উঠবে। এক মনের যে কোনো এক বিষয়ের আগুন দশ মনে ছড়িয়ে পড়বে দশ রূপে। এক হাতের আগুন সাত হাতেও নেভান দুষ্কর।

যে কোনো উপায়ে মনের আগুন নেভানর চেষ্টা করা উচিত সকলের।

সনচরি তো মন তৈরি করার কথাই গানে বলে বেড়ায় সবাইকে। ভালোবেসে শেখায় সবাইকে। তবে সনচরিকে নিয়ে কেন এত রেষারেষি! মানুষে মানুষে কেন এত মনোমালিন্য! কেন তাকে অগ্রাহ্য অবহেলা। কেন ন্যায়কে অন্যায় ভাবা!

নীলাম্বর দাদু বলেছে, সহ্য ধৈর্যশক্তি বাড়ুক সনচরির।

লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান অবহেলা—সব কিছুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে হবে। আশা, যদিও বা দুরাশা, একদিন না একদিন বুঝবে লোকে।

অন্তত নিজেকে তো ভালো রাখা যায়। দু চার জনকেও ভালো করা যায়। কে বলতে পারে, এই ভালোর ছোঁয়ায় সকলে ভালো হয়ে উঠতে পারেও তো!

নীলাম্বর দাদুকে মান্য করে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে সনচরি। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের কথা মন থেকে ঠিক মতো মেনে নিতে পারে না সনচরি।

মনে হয়, প্রশ্নটা বুঝি ঠিক করা হয় নি। উত্তরটাও ঠিক মেলে নি।

যাই হোক, সনচরির মন যা চায়, তা থেকে সরা এখন অসম্ভব।

নীলাম্বর দাদুর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেও পরিস্থিতি-পরিবেশ তাকে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে।

তীরথ-মার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছে। সনচরির শেষের মতে সম্মতি জানিয়েছে তীরথ-মা।

তীরথ-মা গেয়েছে,

*কেন ভালোবাসিরে আমি জানি না*
*যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলাষী আমি জানি না*
*বাসে কি না কেউ বাসে ভালো*
*আমি যে বেসেছি ভালো*
*এটুকুই থাক ভালো*
*অন্য কিছু মানি না*

ওদিকে পাশের গ্রামে চার দিনে চাব অবস্থা।

সনচরি যায় নি দিন চারেক।

সে একেবারে কুরুক্ষেত্র, লঙ্কাকাণ্ড।

রামায়ণ মহাভারত।

নতুন উঠতি তাজা রক্তের ছেলেদের তুলকালাম।

মারপিট। দাঙ্গা।

রান্নার হাঁড়ি চাপাতে দিচ্ছে না এই ছেলের দল।

আট নয় দশ বাবোব কিশোর-কিশোরীরা নিজে হাতে তুলে নিয়েছে নিজেদের বিচার। এবা স্বাধীন। কারও কথা শুনবে না। মা বাপ গ্রামের লোক—সব এদের কাছে দুশমন। তাদের সনচরি মাঈকে তাড়িয়েছে এরা। সকলে মিলে পরামর্শ করে।

বোঝাতে গেলেও কিছুতেই বুঝতে চাইছে না।

দুধের গেলাস মুখে ধরলে গেলাস ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। মা-বাপের মুখে দুধ ছুড়ে দিচ্ছে। রান্নার আগুনে জল ঢালছে!

গ্রামের কাউকে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

একসঙ্গে কুড়ি-বাইশটা ছেলে-মেয়ে এক হয়ে এইসব কাজ করে বেড়াচ্ছে। দাপাদাপি। লাফালাফি। ঘরের বাসনপত্তর ভেঙে চুরমার।

চারদিন ধরে রান্নাবান্না সব বন্ধ।

এরা কারও কথা শুনবে না। কাউকে মানবে না।

এদের হাতে মা-বাবাদের খোয়ার হতে আর কিছু বাকি থাকছে না।

কিল চড় ঘুষি। কামড়ে রক্ত বার করে দিচ্ছে। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নখ দিয়ে খিমচে মাংস তুলে নিচ্ছে।

বড়দের মহা বিপদ।

ছোটদের ভয়ে তটস্থ।

সর্বনেশে কাণ্ড।

গাঁয়ের বৌয়েরা অনেকে বলাবলি করছে, অগ্নিদেবকে দিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে। এত অশান্তির মধ্যেও দু-একজন হেসে গড়িয়ে পড়েছে।

আ মরি মাঈয়া! সনচরিকো ফান্দা মে অগ্নিদেব গির গ্যয়া। হরবখত উনকি আখোঁ মে সনচরি। সনচরি। নেশা কা পেয়ালা কা মাফিক হরবখত ঘুমতা ফিরতা সনচরি। আরে রাম রাম—ওকা করবা। উসে কুছ হুমতা হ্যায়! কুছ নহি। কুছ নহি।

রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠছে—সনচরি মাইরে, তু আ যা। হম লোগো কো কঈ দেখতা নহি।

সে কি কান্না!

মা-বাপেরা কিছুতেই ঠাণ্ডা করতে পারছে না ছেলেমেয়েদের। পারছে না কান্না থামাতে। ঘুম নেই। খাওয়া নেই। চব্বিশ ঘণ্টা হা-হুতাশ। কেয়া কিয়া যায়! কেয়া কিয়া যায়!

ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ছেলেমেয়েরা। ঘর ঘর।

সনচরিকে ডেকে নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে ছেলেমেয়েদের মা-বাপকে।

সনচরি ওদের শান্তি। সনচরি ওদের বিমারির ওষুধ। সনচরি ওদের প্রাণখোলা আনন্দ।

এদিকে সনচরিকে ডেকে আনার কথা শোনামাত্র অগ্নিদেব সচেতন হয়ে উঠেছে। মাথায় মন্দির চুড়ো করে বাঁধা জটা কাটার ব্যবস্থা করেছে। ধুনো দিয়ে তৈরি করা জটা খসে খসে পড়েছে। একেবারে ন্যাড়া।

নাপিতের হাতে দাড়ি গোঁফ উধাও।

মায় বুকের হাতের পায়ের রোম পর্যন্ত।

গায়ের রঙ ফুটে বেরবে এবার।

সনচরি দেখে খুশি হবে। তার ওপর নজর পড়বে।

সনচরিকে মা-বাপেরা নিয়ে এসেছে নীলাম্বর দাদুকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। ওরাই আবার ফেরত দিয়ে যাবে।

বাল-বাচ্চালোগো কো রখসা কিজিয়ে।

এত কান্না আর চোখে দেখা যায় না।

তীরথ-মা, সনচরি, নীলাম্বর দাদু—সবাই কাঁদছে এদের সঙ্গে।

সনচরিকে নীলাম্বর একা ছাড়ে নি।

তীরথ-মাও এসেছে সনচরির সঙ্গে।

তীরথ-মা অবাক।

সনচরি যে ঘরেই ঢুকছে, ছেলে বা মেয়ের কাছে যেতে না যেতেই তারা লাফিয়ে উঠে সনচরিকে জড়িয়ে ধরছে আনন্দে।

কি আনন্দ। কি শান্তি।

না এলে না দেখলে এ অপূর্ব জিনিস দেখতে পেত না জীবনে।

সনচরি এদের কে? বাচ্চাদের?

নীলাম্বর দাদার শুধু প্রাণের প্রাণ নয়, এদের জীবনেরও জীবন। স্বচক্ষে দেখেছে, বুঝেছে তীরথ-মা।

স্পর্শের এত গুণ!

দেখার এত গুণ!

কি হাসিখুশি।

সকলেই খাবার খেতে আরম্ভ করেছে।

মা-বাবার চোখে আর জল নেই। আনন্দের ধারা।

অনেকে বলেছে, আগে আনলে এত অনাসৃষ্টি ঘটত না।

সনচরি কারও গালে কারও কপালে চুমু খেয়ে আদর করেছে। কাউকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমু।

স্বর্গীয় দৃশ্য।

স্বর্গের সুষমায় ভরে উঠেছে প্রাণ।

কি কথায় বলে উঠেছে গাঁয়ের বৌয়েরা, সনচরি দেবী।

সবচেয়ে গলার জোরটা বেশি শোনা গেছে অগ্নিদেবের।—সনচরি দেবী।

দেবীজিকি জয়।

সনচরি হেসে আড়চোখে তাকিয়েছে অগ্নিদেবের দিকে।

দৌড়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছে অগ্নিদেব। হাত নাড়ছে সনচরির দিকে তাকিয়ে। আর মুখে বলছে, দেবীজিকি জয়। দেবীজিকি জয়।

চেলারা হতভম্ব। হতবাক।

গুরুজির একি অবস্থা!

দেখে কষ্ট হচ্ছে।

গুরুজিকে এই মহা-ডাইনির খপ্পর থেকে কি করে মুক্ত করা যায়!

ভাবতে হবে। চিন্তা করতে হবে। কাজটা সহজ নয়।

গাঁয়ের বৌয়েরা বলেছে, বহিন, রোজ এক দফে জরুর আনা। ছমা কিজিয়ে গা। দয়া কিজিয়ে গা। লাড্ডুকে লিয়ে বাচ্চা লোগোঁ মন বহুত বেচ্যায়ন হো যাতা।

বাচ্চারা চিৎকার করে বলে উঠেছে, সনচরি মাঈ ফির আ যায়েঙ্গে।'

কচি গলার সঙ্গে হেঁড়ে গলায় অগ্নিদেব বার বার বলেছে, জরুর আসবে। জরুর আসবে।

সনচরি মুচকি হেসে মাথা দুলিয়েছে।

অগ্নিদেব আনন্দে আত্মহারা।

কপালে হাত ঠেকাচ্ছে। বুকে হাত ঠেকাচ্ছে। আর নিজের মনেই হাসছে। সারা শরীরও হাসছে বুঝি। আকাশের চাঁদ স্বর্গের সৌন্দর্য—সব যেন তার হাতের মুঠোয়।

চলতে চলতে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। সনচরির গাড়ি কতদূর! আর নিজের বুক দু হাত দিয়ে চেপে ধরছে, নিজের আবেগ সমলাতে। ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কেউ দেখছে কিনা। কেউ দেখছে কিনা। কেউ দেখে ফেলেছে কিনা।

আ হা হা।

কি মিষ্টি নাম—'সনচরি'।

মা-বাপের পছন্দ বটে।

ঈশ্বর তার জন্যেই সনচরিকে পাঠিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছে।

হে ঈশ্বর, তোমায় শত শত প্রণাম। কত অপরাধ করেছি তোমার চরণে। তবু তোমার আমার ওপর একি ভালোবাসা। তুলনা নেই। তুলনা নেই। আমার জন্যে তুমি কি পাঠিয়ে দিয়েছ। জীবন ভরের রূপের ডালি।

আদরিণী সনচরি সোনামণি।

কেউ শুনছে নাকি!

কেউ শুনতে পেয়েছে না কি!

চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছে আবার অগ্নিদেব।

ওদের চাউনি যেন কেমন কেমন। চেলাদের।

কি এত দেখছে! একদৃষ্টে!

দেখ ভগবান! ওরা যেন সনচরিকে ছিনিয়ে না নেয়, কেড়ে না নেয়।

তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি সব পার। তুমি দিতেও পার। তুমি নিতেও পার। কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বালাই নেই তোমার। বেহায়া যদি হয় কেউ, শ্রেষ্ঠ বেহায়া তুমি। মান-অপমান সমান তোমার।

নির্লজ্জদের শ্রেষ্ঠ তুমি পুরুষোত্তম।

নিজের নাক কান নিজে ম'লেছে। গাছেতে নাক ঘষে নাক খত দিয়েছে। হে ভগবান, তুমি রুষ্ট হয়ো না।

তোমারই তো করান সব। নিজে তো কিছু করি না আমি। তুমিই গাঁজা খাইয়েছ, তুমিই সিদ্ধি খাইয়েছ।

*লেগেছে আমার নেশার ঘোর*
*খুঁজছি কোথা মন-চোর*

হেসে কুটি কুটি অগ্নিদেব।

চেলাতে চেলাতে মুখ চাওয়াচাওয়ি।

গুরুজির হলোটা কি!

শেষে মাথা খারাপ।

আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব বকে চলেছে।

হাসছে!

এবার কাঁদতেও শুরু করে দিয়েছে।

সনচরি, আমায় ছেড়ে যেওনা তুমি।

আত্মঘাতীর ফল পাবে শেষে।

এতো বিকারের উক্তি।

পাতকো থেকে জল তুলছে চেলারা।

বালতি বালতি জল তুলে মাথায় ঢালছে আর দুজনে দুপাশ থেকে ঘাড় ধরে চেঁপে বসিয়ে রেখেছে অগ্নিদেবকে।

পাতকুয়োর ঠাণ্ডা জলে শীত ধরেছে অগ্নিদেবের।

কাঁপছে আর বলছে, সনচবি, আমাকে বাঁচাও। তুমি ছাড়া আমার আর আপনজন কেউ নেই। আমায় একা পেয়ে মেরে ফেলছে এরা। এরা দুশমন। এরা বেইমান। এতদিন তোমাকে দু চক্ষের বিষ করে রেখেছে—ডাইনি ডাইনি বলে।

আমি দেখেছি তোমাকে। দেখেছি তোমার রূপ। সে রূপ ম'লেও ভুলতে পারব না। তুমি দেবী। তুমি দেবী।

চেলাদের মধ্যে হতাশা।

মহা-ডাইনি সনচরি গুরুজির সব শক্তি হরণ করে নিয়েছে।

গুরুজির আর একটুও শক্তি নেই।

গুরুজি এখন অতি সাধারণ।

সাধারণের চেয়েও সাধারণ।

চেলাদের মধ্যে থেকে বীরদেওকে বলা হয়েছে, তাকেই প্রধান বলে মেনে নেবে

এবার থেকে।

প্রধানের পদ থেকে অগ্নিদেব বাদ।

সম্মান-মান ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠেছে অগ্নিদেব। এখন নরকের পথে। জাহান্নামের পথে।

তাই থাক।

ওঠাতে কেউ সাহায্য করবে না।

মরে গেলেও ওর মুখে এক ফোঁটা জল দেবে না কেউ।

অন্য কোনো কথা মুখে নেই। কেবল—সনচরি। সনচরি।

যাক, ও নরকে। যাক ও পাতালে। মরুক। ঘুরুক ভূত হয়ে।

এমন গুরুর মুখে ছাই।

ঘেন্না। ঘেন্না। ঘেন্না।

কি ভুল করেছে তারা অগ্নিদেবকে গুরুর আসনে বসিয়ে।

অযোগ্য।

*আগে তো ছিল না জানা*
*খোসার ভেতর পচা দানা*

সনচরি নিয়মিত আসে যায়।

বাচ্চাদের রামদানার লাড্ডু খাওয়ায়। হাসি গল্প করে। আর যাওয়ার সময় করুণাপ্রার্থী অগ্নিদেবের দিকে আড়চোখে তাকায়। তারপর নিজেকে আর সামলাতে পারে না। গাড়ির ওপর উঠে ময়ুরটাকে বুকে চেপে ধরে, পিঠে মুখ গুঁজে খিল খিল করে হাসতে থাকে।

সারা শরীর হাসির নাচনে দুলে দুলে ওঠে। গাড়ি চলতে থাকে।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে ফিরে তাকায়।

কৃপাপ্রার্থী অগ্নিদেব জোড়হাতে দাঁড়িয়ে।

পাকা ধুঁধুলের বিচির মতো দাঁত বার করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে।

গাড়ির ওপর হাসিতে গড়াগড়ি খায় সনচরি।

দূর থেকে দেখে দেখে একদিন ছুটে এসেছে ধরমিয়া।

সনচরি এমন করে কেন! ওর কি মৃগী রোগটোগ হয়েছে নাকি! কষ্ট, আগে তো এমনতর দেখে নি।

একদিন দৌড়ে এসে পিঠে এক চাপড়।

ধরমিয়াকে দেখে সনচরি হাসি থামাতে ওড়নার কোণ মুখে গুঁজেছে।

কেন হাসে, চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছে।

হা হতোস্মি!

ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে অগ্নিদেব।

শুকনো মুখ।

বেচারা!

কি দুরবস্থা!

হাসতে হাসতে নাচের ভঙ্গিতে পথ থেকে গ্রামের ভেতর ঢুকেছে ধরমিয়া।

মাতালের মতো হাসির দমকে এর ঘাড়ে পড়ছে তার ঘাড়ে পড়ছে।

বুড়িমাসি বলেছে, মরণ আব কি! রাতে সিদ্ধি খেয়েছিস বুঝি! শরীর এত টলমল। বুড়িমাসি দূর করে ছড়া কেটে বলেছে,

*ডোলে ডোলে নাইয়া মোরা*
*সাঁইয়া কাঁহা গেইল হো*

কোমরে দু হাত দিয়ে বুড়ি মাসি তিন পাক নেচে নিল গান গাইতে গাইতে।

গাঁয়ের বৌ-মেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে দিয়ছে বুড়িমাসির সঙ্গে। মাঝখানে বুড়িমাসি। হাততালি আর হাসি বাতাসে ঢেউ তুলছে।

লক্ষ অগ্নিদেব।

*পানিয়া ভরনে চললো গোরি*
*আইলন নাগর রহল ঠারি*
*বিনতি করত তেরে মত যাও নাগরিয়া*
*পানিয়া ভরনে দেরে ভর যায় গাগরিয়া*
*জাদু কিয়া নাগরিয়া মোহে তেরে আঁখিয়া...*

কোনো খেয়াল নেই অগ্নিদেবের।

কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

কে তাকে দেখছে হাসছে কে তাকে দেখে ভ্যাংচাচ্ছে, কে হাসি-মশকরা করছে, তার ব্যাপারটা সে-ই জানে। আর কেউ জানতে পারছে না। পারবে না। বোকা-মরণের ভাবনা।

এদিকে কিন্তু বীরদেও রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে দিন দিন।

গুরুজির আচার-আচরণে তীব্র ক্ষোভ। তীব্র রোষ। গুরুনিধন যজ্ঞ না করতে হয় তাকে শেষে।

হায় ভগবান!

তোমার কি লীলা!

ডাইনি-নিধন যজ্ঞ করতে এসে শেষে গুরুনিধন যজ্ঞ।

দুনিয়া উল্টো দিক চলে কি?

তবে নদীর জলে উজান বয় বটে।

সনচরির অসীম শক্তি।

তা না হলে অগ্নিদেবের মতো গুণিন একেবারে কুপোকাত!

বদলা নিতে হবে এর।

সনচরিতে ছাড়লে চলবে না।

সনচরির সামনা সামনি না, তফাতে তফাতে। যা কিছু করার তফাত থেকে।

সামনা সামনি পড়েই তো অগ্নিদেবের এই দশা।

ওর জাদুর মায়ায় কোন রসাতলে তলিয়ে গেছে অগ্নিদেব। চোখের সামনে দেখা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ অগ্নিদেব।

এখন এমন হয়েছে সনচরি নাম শুনলে আত্মারাম খাঁচা।

তাবড় তাবড় মানুষ ভয়ে জড়সড়।

দাঁতি লেগে অজ্ঞান হয়ে যেতেও দেখা গেছে।

সব কিছু চুপি চুপি।

গোপনে গোপনে।

তলায় তলায় সনচরির বিপদ ডেকে আনার চেষ্টা করে চলেছে অগ্নিদেবের চেলারা।

গ্রামে আসা বন্ধ করতে হবে যে কোনো উপায়ে।

কে জেনেছে যে রক্তঝরা ঘটনাকে ডেকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে ওরা।

শীত ভোরে গোরুর গাড়িতে চড়ে সনচরি আসছে।

বাঁশির আওয়াজে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছে সকলে।

মুখে হাসি। চোখে হাসি।

বাচ্চারাও মা-বাপের পাশাপাশি।

গাড়িটা সামনে এসে থাকতে না থামতেই গাড়ির ওপর ইটের টুকরো বৃষ্টি হতে শুরু করে দিয়েছে।

সকলে চিৎকার করে উঠেছে—মত কর মত কর। অ্যায়সা কাম মত কর। কোন শয়তান হ্যায়!

ময়ূরটাকে বাঁচাতে গিয়ে সনচরির মাথায় ইটের টুকরোর ঘা লেগেছে।

কেটে রক্তারক্তি।

ধরমিয়া লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে এসে সনচরিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। পাছে না গুরুতর আঘাত ছিটকে পড়ে তার বুকে।

সনচরির বুকে পড়েনি।

পড়েছে ধরমিয়ার পিঠে।

মোক্ষম আঘাত।

ধরমিয়ার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অস্ফুট আর্তনাদ—উঃ!

গাঁদা ফুল গাছের পাতা আঙুলে ডলে সনচরির মাথার রক্ত মুছিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে ধরমিয়া। মুখ বুজে নিজের পিঠের যন্ত্রণা সহ্য করে।

সুদাম এসে বলেছে সনচরিকে, বহিন, বহোত চোট লাগা। হমলোগোঁকে লিয়ে ইয়ে কেয়া হালত হুয়া আপকা।

সনচরি মৃদু হেসে বলেছে, ভাইয়া, হামারা চোট নহি। আপলোগোঁকা জাদা চোট লাগা। এহি দুখকে কারণ।

ধরমিয়ার ভেতরটা কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে পিষে দিয়েছে। পিঠের চেয়ে ভেতরের যন্ত্রণা বেড়ে উঠেছে।

একি শুনল সে!

সুদামের দুখে 'বহিন'!

সনচরির মুখে 'ভাইয়া'!

এতদিন নিজের সৃষ্টি করা সন্দেহ রোগে বেকার ভুগে মরেছে ধরমিয়া। কি ভুল। কি ভুল!

বুকে-পিঠে যন্ত্রণা নিয়ে আনন্দের হাসি, শান্তির হাসি হেসেছে ধরমিয়া—সুদামের দিকে তাকিয়ে একবার। আর একবার সনচরির দিকে তাকিয়ে।

ইটের টুকরোর বৃষ্টি থেমে গেছে। যখন বাচ্চারা পাল্টা ঢিল ছুড়তে আরম্ভ করেছে। যে ধার থেকে ঢিল আসছিল, সেই দিকে।

যারা করেছে, তারা নাশ হোক। নাশ হোক। নাশ হোক।



বাড়িতে ফেরার রাস্তায় উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তীরথ-মা। সনচরির ফেরার অপেক্ষা করছে। গাড়ি থেকে নামতেই বুকে জড়িয়ে ধরেছে সনচরিকে।

খুব লেগেছে! বল! সত্যি কথা আমার কাছে বল।

না। খুব লাগেনি। লেগেছে ধরমিয়ার। ময়ূরটা বেঁচে গেছে।

তুই এখন কেমন আছিস?

আস্তে আস্তে বলেছে সনচরি, ভালো। ভালো। খুব ভালো। মাঈয়া তোমার মেয়ে সনচরি এত সহজে মরবে না। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার নাকে সর্ষের তেল দিয়ে।

থাম।

বেশ জোরেই বলেছে তীরথ-মা।

শিগগির ভেতরে চল।

এতক্ষণে দাদা বেঁচে আছে কিনা কে জানে! তোর জন্যে কি হানটান। ঘববার। ঘরবার। কেবল বলেছে, নিশ্চয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে তীরথ-মা। আমার মন বলেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, অন্ধকার। অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না—এত জমাট অন্ধকার। ডাক শুনছি শকুনের, শেয়ালের, কুকুরের।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে।

কিসের?

চিতার।

চারদিকে মৃতদেহ ছড়ান।

সনচরি বেরলেই এ দৃশ্য আমার চোখে ভাসে। এ দৃশ্য আমায় বড় জ্বালায়। বড় যন্ত্রণা দেয়। বুকটা চেপে বসে থাকি। কি ধড়াস ধড়াস শব্দ। আওয়াজও শুনতে পাওয়া যায় কানে। অন্য দিনের চেয়ে আজ বড্ড বেশি। দেখ তীরথ-মা, রাস্তায় গিয়ে একটু দেখ। সনচরি আসছে কি!

তাড়াতাড়ি চ বাড়ির ভেতর।

ঘরে ঢুকে দেখে টেবিলে মাথাটা ঠেকান।

চেয়ারে বসে নীলাম্বর।

ঢুকতেই সজাগ হয়ে উঠেছে।

আয়, কাছে আয়।

মাথায় হাত দিয়েই বলেছে, লেগেছে! কি সে লাগল!

সনচরি চুপ। ঠোঁটের কোণে হাসি।

কি সে! কি সে!

তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না। মরি নি তো!

মনশোভা পাশে বসেছিল। বলে উঠেছে, অলুক্ষুণে কথা মুখ দিয়ে নাইবা বের করলি! তোকে আর যেতে হবে না ও গ্রামে। গেলে এবার দাদুকে আর জ্যান্ত দেখতে পাবি না। কি করে যে সামলাই, তা একমাত্র আমরাই জানি। যার হয় সেই জানে। অন্যে কিছু না মানে।

নীলাম্বর টেবিল থেকে জলের গেলাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে।

জলে গলা ভিজিয়ে বলেছে একটু একটু করে, কেন এত ভয় জানিস! দেখেছি শুনেছি যে আমি নিজে। এখনও তো কাগজে-কলমে দেখে যাচ্ছি। পড়ে যাচ্ছি। কোথায় মানুষের মনের পরিবর্তন! হয়েছে কি! হয় নি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই আগের নির্যাতন চলেছে। সেই মেরে ফেলা। সহমরণের স্মৃতি জাগিয়ে রাখা হয়েছে নানা ভাবে। তাই নয় কি! হলফ করে কি কেউ বলতে পারে, তাই নয়! পারবে না। পারবে না। যা সত্যি, তা চিরকালই সত্যি। একচুল নড়চড় নেই। দেশের জন্যে দশের জন্যে রামমোহন রায় কম চেষ্টা করে গেছেন সতীদাহ বন্ধ করবার। সম্পূর্ণ পেরেছেন! এখনও তো কোনো জায়গায় না কোনো জায়গায় একই দৃশ্য।

ইবন বতুতার যুগে তিনি সহ্য করতে পারেননি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু দেশের লোকের দেখে দেখে কি জ্ঞানোদয় হয়েছে আজও? হয় নি।

কবে হবে কে জানে!

আজ থেকে প্রায় সাতশো বছর আগের ঘটনা।

সর্ব শরীর শিউরে ওঠার ঘটনা।

মরক্কোর মানুষ ইবন বতুতা কি দেখেছে, দিল্লির কাছে অমঝোরে?

দেখেছে যুদ্ধে পতিহারাদের 'সতী' হতে।

ঘোড়ায় চেপে সুন্দর সাজে সেজে আসছে মহিলারা এদিকে। এক হাতে নারকেল। আর এক হাতে আয়না।

দু পাশে দু সারি লোক। সতীদের জয়ধ্বনি দিচ্ছে আর বলছে, যেখানে যাচ্ছ তোমরা, আমাদের কথা একটু জানিয়ে দিও তাদের। যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে,

আমাদের আপনজনেরা।

হাসিমুখে সতীরা বলেছে, নিশ্চয়। নিশ্চয় জানাব।

তারপর ঠিক জায়গায় এসে ঘোড়া থেকে নেমে সাজসজ্জা, গয়না ছেড়ে ফেলেছে। ঐ জায়গাটা ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা। পুকুরের জলে চান। মন্দিরে পুজো।

গায়ের গয়না শাড়ি এক এক করে দান করে দিয়েছে অন্যকে।

মোটা কাপড় পরে এগিয়ে চিতার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে 'সতী'। লকলকে শিখা আকাশ ছুঁই ছুঁই।

ব্রাহ্মণদের চিৎকার, তুমি অমরলোকে যাচ্ছ। স্বামীর সঙ্গে তোমার স্বর্গে বাস। তুমি চির অমর। মর্ত নরকঃ মা স্বর্গধামে গময়ঃ।

মর্তের নরক থেকে তুমি স্বর্গধামে গমন করছ। তোমার জয়।

'সতী' চিতাকে দু হাতে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আগুনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মোটা মোটা কাঠ ফেলে দেয়া হয়েছে 'সতী'র দেহের ওপর। চেপে ধরে রাখা হয়েছে কাঠ দিয়ে, যেন উঠতে না পারে আর।

ঢাক ঢোল শিঙা বেজে উঠেছে জোরে জোরে।

চতুর্দিকে জয়ধ্বনি 'সতী মাঈ'-র।

দেখে ইবন বতুতা প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

কি মর্মান্তিক। কি বিভৎস।

কোথায় স্বর্গ! কোথায় নরক!

কেউ জানে না। কোনো প্রমাণই তো দেখাতে পারে না।

কার স্বামীর আত্মার সঙ্গে করে কোন স্ত্রীর মিলন হয়েছে, একথাও তো কেউ বুকে হাত দিয়ে প্রমাণ করতে পারে না।

শুধু স্বার্থ আর ভুল ধারণার সংস্কার-শেকলে বাঁধা মানুষের মনের কীর্তি-কলাপ।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বিষয়ী ব্যাপার নিয়েই সরিয়ে দেয়া হয় আর একটা নির্দোষ নিরীহ জীবনকে নির্দ্ধিধায়।

বিদ্যাসাগরমশাই, রামমোহন রায়ও বিধবাবিবাহের সমর্থনে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু বিধবাবিবাহে নির্যাতন কি ঘুচেছে কোনো স্ত্রীর?

নীলাম্বর ভুক্তভোগী।

মেয়ে বিধুরেখার দু বার বিয়ে।

একবার পুড়িয়ে মারার চেয়ে শতবার পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাকে। যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা।

অনেক চেষ্টা করেছে মা স্বর্ণশিখা আর পিতা নীলাম্বর বিধুরেখাকে শান্তি দেয়ার।

মেয়েটার আজ কি দশা! সব স্মৃতি হারিয়ে জ্যান্তে মরা।

বিষয়ী ব্যাপার নিয়ে স্বার্থের জন্যে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

নীলাম্বর কাঁদছে।

হাঁপাচ্ছে।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

মনশোভা সনচরি বুকে-পিঠে হাত বোলাচ্ছে।

মাথায় তীরথ-মা।

সনচরি বলেছে, দাদু, আর আমরা শুনতে চাই না।

মনশোভা বলেছে, দাদু, আমরা তো বিয়ে করব না বলেই দিয়েছি। তখন আমাদের এ সব কথা শুনে লাভ কি! বেঁচে থেকে আমরা কোনো মৃত্যু-যন্ত্রণা পাব না। জ্যান্তে মরা হয়ে থাকব না। তোমায় কথা দিচ্ছি। তুমি চুপ কর। তুমি আর কেঁদনা।

মনশোভা বলেছে, পিতার অসুর রক্ত আমার দেহে রয়েছে জানি। বিয়ে করে আর একটা অসুরকে পৃথিবীতে এনে অশান্তির বোঝা বাড়াতে চাই না আমি।

সনচরির দিকে চেয়ে থেকেছে খানিক নীলাম্বর।

শিউরে উঠেছে একটু।

আজ যা অবস্থা হয়েছে তোর, এবার তোরও মৃত্যু আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তোকে ডাইনি বলে প্রচার করেছে। তোকে ডাইনি বলে ইট-পাটকেল ছুড়েছে। ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায় নি। মানুষের বর্বর বুদ্ধির হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এই মর্মান্তিক সমস্যার সমাধান কিসে?

একটু চুপ করে থেকে নিজের প্রশ্নের নিজেই জবাব দিয়েছে তীরথ-মা। যতটুকু মনে হয়, পুরুষদের মনের বিষ নিশ্চিহ্ন হলেও মেয়েদের মনের বিষও নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উচিত। যদিও তুলনায় মেয়েরা কম।

তাহলেও দুপক্ষের মনের বিষ আর প্রবৃত্তির আগুন শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিত শান্তি আসবে। শুধু সংসারে নয়, সংসার সমাজ, দেশ-বিদেশ—সর্বত্র।

নীলাম্বর বলেছে, তোমার কথায় আমার মন সায় দিচ্ছে। ঠিকই বলেছ তুমি।

নীলাম্বরের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তীরথ-মা বলেছে, তা-লে দুরাশা কিছু নেই। আশায় বুক বেঁধে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। হেরে হেরেও জিততে হবে। ভয়ের পেছনে অভয় লুকিয়ে আছে। পরাজয়ের পেছনে জয়। আর সর্বনাশের পেছনে সর্ব আশার বীজ। কথাটা প্রণবানন্দ পিতাজি মহারাজের।

সনচরির মুখে হাসির ঢল নেমেছে।

চোখ হাসছে। মুখ হাসছে।

সনচরির হাসি দেখে নীলাম্বর বলেছে, তোর যাওয়াটা বন্ধ রাখ। ওখানে গেলে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আমার মন বলছে হয়ত তোকে হারিয়ে ফেলতে পারি। তোর জন্যে আমি নিজেও হারিয়ে যেতে পারি। আমার বুকের অবস্থা ভালো নয়। আমার মৃত্যুর কারণ তুই যেন না হোস।

সনচরির দু চোখে জল।

দাদু, তুমি এ কথা বার বার বোলো না। মনকে দুর্বল কোর না।

মনোবল ঠিক রাখ।

মানুষের জীবনে না চাইতেই আসে দুর্গতি। আসে মৃত্যু। এরা আমাদের খুব ভালোবাসে। সবাই ছেড়ে গেলেও এরা কিন্তু কখনই ছাড়ে না।

এরা তো রয়েছেই। এদের এত ডাকাডাকি করাটা কি ভালো!

নীলাম্বর বলেছে, যাই হোক, আমি বেঁচে থাকতে তুমি আর যেও না।

যাওয়া বন্ধ হয় নি সনচরির।

ধরমিয়ার সন্দেহ-বাতিক রোগ সেরে গেছে।

সুদামকেই বেশি পাঠায়।

একা পাঠাতে আর ভয় পায় না।

সুদাম আসে। সনচরিকে নিয়ে যেতে।

চোখের ইশারায় সনচরি দেখিয়ে দেয় নীলাম্বরকে। নীলাম্বর বললে সনচরি যাবে।

পায়ে ধরে হাতে ধরে কেঁদেকেটে সুদাম নীলাম্বরের কাছে গাঁয়ের ছেলেদের জীবন ভিক্ষা চায়। সনচরি না গেলে নির্ঘাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষে করা যাবে না ওদের। কোনো ভয় নেই। সনচরিকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব সুদামের।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ে যাওয়ার মত দিতে বাধ্য হয়েছে নীলাম্বর।

সনচরি আগেকার মতো আবার যেতে শুরু করে দিয়েছে।

খুশির জোয়ারের ঢেউ গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

ছেলে-মেয়েরা সুস্থ হয়ে উঠছে। খুব হাসিখুশি।

দৌড়-ঝাঁপ আর খেলাধুলোয় মেতে উঠছে।

গ্রামটায় নতুন করে নতুন প্রাণ ফিরে এসেছে বুঝি।

দুষ্টু না মানে শিষ্টজনের কথা।

অগ্নিদেবের চেলারা তলায় তলায় শলা-পরামর্শ করেই চলেছে।

সনচরি ডাইনি। গোটা গাঁওটাকে নিজের কবজায় এনে ফেলেছে।

বাচ্চাদের মায়েরা-বাপেরা দেখা যাচ্ছে সনচরির বাধ্য-অনুগত হয়ে উঠেছে।

সনচরির এই আধিপত্য বিস্তারের ভিত ভেঙে তছনছ করে দিতে হবে।

মুখিয়ার স্ত্রীকে গিয়ে বলেছে, এখনই হুঁশিয়ার হও। দেরি হলে বিপদ। বরাবরের জন্যে তোমার স্বামী হাতছাড়া হয়ে যাবে। দেখেশুনে ঘুমিয়ে থেক না। যে কোনো উপায়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সনচরির মুখ কেউ না আর দেখতে পায়। কীভাবে কি করা যায়, সেই চিন্তাটাই এখন প্রধান।

এদিকে অগ্নিদেব নিজের কোনো কথাই গোপন না করে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছে সনচরিকে। তোমার ভেতরে যে শক্তি রয়েছে, যে শক্তিতে এত ছেলেপুলে তোমার বাধ্য, তোমার স্পর্শে দৃষ্টিতে তারা খুশি—তারা সুস্থ হয়ে উঠছে, তোমাতে আমাতে এক হয়ে যদি কাজ করি—আমার ক্রিয়া-কলাপ তোমার শক্তি, তাহলে দুটো গ্রামই আমাদের হাতের মুঠোয়। এটা কি সম্ভব হতে পারে না?

অগ্নিদেব কি বলতে চায়, সেটা আর বুঝতে বাকি থাকে না সনচরির।

একটু গম্ভীর হয়ে গেছে।

গম্ভীর গলায় বলেছে, বেটে অপনেকো আপ সমহালকে রাখখো।

অগ্নিদেব বললে, মাফ কিজিয়ে গা।

সনচরি কি সত্যিকারের মা তা হলে!

হ্যাঁ, তাই তো। অগ্নিদেবের মায়ের মুখ, চেহারায় মায়ের আদল—দেখছে সনচরির মুখে, চেহারায়।

বাবা কাজকর্ম করে যেটুকু সঞ্চয় করে গেছে, শয্যাগত অবস্থায় সেটুকু নিঃশেষ।

কত না কষ্ট করে পেটের ভাত জুগিয়েছে।

মনে পড়তে বুক ফেটে যায় অগ্নিদেবের।

কারও কাছে বলতে লজ্জা।

মাথার ঘোমটা টেনে, লজ্জায় মুখ ঢেকে একটা কৌটো হাতে করে দাঁড়িয়ে থেকেছে মা কলকাতার এক এক পাড়ায়। যেখানে গাড়ি দাঁড়ায় বেশি, সেজেগুজে ধনীরা আসা যাওয়া করে।

কৌটোতে যে যা দিয়েছে, নিয়ে এসেছে।

এইভাবে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সবই মায়ের শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

কত সহ্য। কত যন্ত্রণা।

অগ্নিদেবের বয়েস তখন বারো। কি কাজ করবে! কে কাজ দেবে!

চেষ্টা করেও মায়ের দুঃখ মোচন করতে পারে নি।

এও ছিল ভালো।

সামনে যে কাল গ্রাস করতে আসছে, সেটা বড়ই অজানা।

দুর্গাষষ্ঠীতে ছেলের জন্যে উপোস।

মঙ্গল কামনায় গঙ্গায় চান করতে নিয়ে গেছে।

মায়ের হাত ফসকে পা পিছলে হঠাৎই অনেকটা দূরে চলে যাওয়ায়, মা চিৎকার করে ওঠে—বাঁচাও। বাঁচাও। কি আকুলি বিকুলি।

সাঁতার জানে না, তবু এগিয়ে গেছে ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে।

নৌকোর মাঝিরা জল থেকে তুলেছে মা-ছেলেকে। এক নৌকোয় অগ্নিদেব। আর এক নৌকোয় মা। জ্ঞান হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার পর খুঁজে খুঁজে কোনো হদিশ পায় নি মায়ের?

মা কোথায়?

হাসপাতালে কি?

খুঁজে খুঁজে হয়রান। মেলে নি।

কারও বাড়িতে কি?

পাগলের মতো এখানে-ওখানে গিয়ে গিয়ে চিৎকার করে মা-মা বলে ডেকেছি। তার গলার আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসবে কখনও।

কেউ আসে নি। মনের ধারণা ভুল।

এরপর সাধু-সন্তদের কাছে ধরনা দিয়েছে।

পায়ে ধরে কেঁদে বলেছে, মায়ের দেখা কি আর জীবনে পাব না?

সঠিক উত্তর দেয় নি কেউ।

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছে।

একজন খালি সহানুভূতির স্বরে বলেছে, ওপরঅলার ওপর সব ভার ছেড়ে দে। নিজে কিসে বাঁচিস চেষ্টা কর। আসন শেখ। আসন শেখাবি। পেটের ভাত জুটে যাবে।

আসন শিখেছে।

পেটের ভাত জুটেছে।

তবু মন ভরে নি।

ভগবানকে কাছে পেলে, ভগবানের দেখা পেলে নিশ্চয় মায়ের হদিশ জানতে পারবে।

জাদুকরদের খেলা দেখে মনে হয়েছে—হাত ঘোরালে কত না জিনিস এসে পড়ে এদের কাছে। নিশ্চয় ভগবান এদের দেয়।

আশ্রয় নিয়েছে জাদুকরের। শিখেছে ম্যাজিক।

শিখেছে বাকচাতুরি আর হাতের কারিকুরি।

এখানে ভগবানের সন্ধান পাবে না।

অগ্নিদেব বড় হয়ে নকল জটা করে সাধু সেজে আসন দেখিয়ে আর ম্যাজিকে মুগ্ধ করেছে মানুষকে।

আসলে, সনচরির মতো ভেতরের সত্যি কোনো সাধনা বা ধ্যানজপ করতে পারে নি অগ্নিদেব। করেনি। শেখবার জন্যে তেমন কারও সন্ধান পায়নি।

সব শুনে সনচরির চোখের কোণে জলের ফোঁটা টলমল করে উঠেছে।

পিঠে মাথায় স্নেহের স্পর্শ পাচ্ছে অগ্নিদেব। মন মাথা বুক শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

কার স্পর্শ?

কার আবার?

মায়ের।

অগ্নিদেবের মা।

সনচরি-মা।



দাউ দাউ আগুনের লকলকে শিখা উঠছে ওপরে। আরও ওপরে।

আকাশ লাল।

ধোঁয়ায় ধোঁয়া।

গাঁয়ের শেষের দিকে বাড়ি হলেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তীরথ-মার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠেছে।

কত বারণ করা হয়েছে সনচরিকে। দিনটা ভালো না। অমাবস্যা।

যেতে দিতে চাইছে না মন।

না, যাবে।

ধরমিয়ার ছেলেটা—ঐ যে কিশোরা, ওর খুব জ্বর। বিশেষ করে যেতে বলে গেছে সুদাম। কোনো ভয় নেই। কোনো চিন্তা নেই। সনচরি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

একি বিপদ!

দুটো গ্রামের চতুর্দিকেই আগুন।

থাকতে পারেনি তীরথ-মা।

চিৎকার করে উঠেছে, জল জল জল। নেভাও নেভাও নেভাও।

বোশেখের দুপুর রোদ্দুর গাঁয়ের সব কিছু তেতে আগুন হয়ে আছে। তার ওপর এই আগুন! সব যে শেষ হয়ে যাবে।

দু চোখে জলের ধারা নেমেছে তীরথ-মায়ের।

আকাশের দিকে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলছে, জানি না ঈশ্বর তুমি আছ কিনা।

আকাশ তুমি আছ। বৃষ্টি তুমি আছ। মেঘ তুমি আছ। আমার কাছে তোমরাই আমার ঈশ্বর।

মেঘ তুমি একটু বৃষ্টি দাও। নেভাও নেভাও।

আমি নিঃস্ব। কি দোব তোমাদের! দু ফোঁটা চোখের জল। পেট ভরবে না। দয়া করো।

বৃষ্টি নামে নি। আগুন নেভে নি।

কেন এমন হলো! এরকম হবে ভাবা যায় নি কখনও।

মুখিয়ার জরু বাইরে থেকে অনেক লোক আনিয়েছে।

তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে অগ্নিদেবের চেলা চারজন।

এক একজন বিদ্বেষের প্রতিমূর্তি।

মুখিয়া এগিয়ে রয়েছে। এরা পেছিয়ে।

সনচরিকে শাসাচ্ছে মুখিয়ার জরু।

মারমুখি হয়ে তেড়ে তেড়ে আসছে।

এক্ষুনি এই মুহূর্তে এই গাঁ থেকে চলে যা ডাইনি। নইলে তোর যে কি সাজা দোব আমরা, তখন বুঝতে পারবি।

লাফিয়ে উঠে বলছে, খবরদার। কভি য়ঁহা মত আনা।

ধরমিয়াও সমান তালে তাল মিলিয়ে বলে উঠেছে সপ্তমে গলা চড়িয়ে, আলবাত আয়েগি। হিম্মত দেখাও আপনা ঘর যাকে, আপনে মরদকে পাস।

পাছে সনচরিকে ঘিরে ফেলে ওরা যে ভাবে এগিয়ে আসছে—ধরমিয়া সুদাম আর গাঁয়ের বাচ্চারা সনচরিকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করছে। যাতে সনচরির গায়ে কারও হাত না পড়ে। চ্যাঁচামেচি, বাগ-বিতণ্ডা হতে হতে সনচরির পক্ষের দুটি গ্রামেরই লোকেরা—স্ত্রী-পুরুষ এসে হাজির হয়েছে।

মুখে মুখে রটে গেছে, সনচরিকে মেরে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে।

মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো হাতে হাতে মশাল নিয়ে ছুটে এসেছে।

সকলেরই রক্ত মাথায় উঠে গেছে।

কথা কাটাকাটি থেকে ডাণ্ডা পেটাপেটি। লেগে গেছে মশাল-যুদ্ধ।

চতুর্দিকে চিৎকার—আগুন আগুন।

মাটির একতলা দোতলা—খাপরা, খড়ের ঘর, সব জায়গায় আগুন।

তীরথ-মা চিৎকার করে ডাকছে—সনচরি সনচরি সনচরি।

আকুল কান্নার আওয়াজে কিছু শোনা যাচ্ছে না আর।

সনচরি শুনতে পেয়েছে কিনা জানে না তীরথ-মা।

তীরথ-মা স্বচক্ষে দেখছে আগুনের ওপাশ থেকে কিশোরাকে দু হাতে বুকে চেপে ছুটছে সনচরি।

ওকে ঘিরে সুদাম অগ্নিদেব ধরমিয়াও। আছে বাচ্চা ছেলে-মেয়েরাও।

কান্নার শব্দ ভেদ করে ধরমিয়া সুদাম অগ্নিদেব আর বাচ্চাদের গলার আওয়াজ বাতাসে মিশে যাচ্ছে—সনচরি মাঈয়া হোঁশিয়ার হোকে—বাঁচকে—

পায়ে পায়ে ফিরে এসেছে তীরথ-মা। অবসন্ন-ক্লান্ত।

নীলাম্বরের বাড়িতে প্রবেশ করতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

স্বর্ণশিখার নিজে হাতে পোঁতা গাছটা জড়িয়ে ধরেছে নীচের বেঞ্চিতে বসে নীলাম্বর। পাশ থেকে দাদুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মনশোভা।

জানলা দিয়ে আগুনের শিখা দেখার পর বাড়ি থেকে বেরতে গিয়ে বেরতে পারে নি নীলাম্বর।

সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছে।

নিজেকে সামলাবার শেষ চেষ্টা।

কোনো রকমে টলতে টলতে কৃষ্ণচূড়া গাছের বেঞ্চিটার নীচে এসে বসে পড়েছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে জড়িয়ে ধরেছে।

তারপর লুটিয়ে পড়েছে মাথা।

মনে মনে বলেছে তীরথ-মা, কেন চলে গেলে দাদা! একটু অপেক্ষা করতে পারলে না। আমার আসাটা অবধি। আমি যে স্বচক্ষে দেখে এসেছি ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে দৌড়চ্ছে ওরা। তুমি শান্তি পাও।

নীলাম্বরের নিষ্প্রাণ দেহের দুপায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে তীরথ-মা। মুখে বলেছে, তোমার অমর আত্মাকে শ্রদ্ধা জানাই।



তীরথ-মা বেঁচে থাকবে।

যতদিন না সনচরি তাকে দেখতে আসে একবার, ততদিন।

মাস তিনেক হয়েছে আগুনে পোড়া দুটো গ্রামের ধ্বংসস্তূপে আবার নতুন গাঁও গড়ে উঠেছে। নতুন বসতি। নতুন নতুন মানুষদের বসবাস।

দু মাসে দু বার এসেছে। অমাবস্যার অন্ধকারেই এসেছে মশালের আলো নিয়ে। এবার নিয়ে তিন বার।

এই অমাবস্যার অন্ধকারেই সেদিন সর্বগ্রাসী আগুন দেখেছে।

বিশ্বাস এই দিনেই সনচরি আসবে তার তীরথ-মাকে দেখতে।

সনচরি জানে তীরথ-মা কতখানি তাকে ভালোবাসে। তীরথ-মার কতখানি সে আপনার। থাকতে পারবে না কিছুতেই।

এখনও আসে নি। হয়ত অভিমান অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-বদনাম শুনতে হয়েছে কানে। আঘাতও পেয়েছে।

বাতাসে কান পাতে তীরথ-মা।

কে যেন গান গাইছে।

সনচরি?

ঝুটে জগ কি ঝুটি প্রীত...

কি দেখছে?

দূরের গ্রামে আকাশ কেন লাল?

ধোঁয়া উঠছে না!

হ্যাঁ হ্যাঁ। সব সত্যি। সব সত্যি। যা দেখছে। যা শুনছে।

একবার বলেছে আগে। আজ আর একবার বলছে তীরথ-মা। আবার।

মেঘ তুমি এসো।

বৃষ্টি তুমি এসো।

নেভাও নেভাও এ আগুন।

একের পর এক কি এই ভাবেই জ্বলবে!

জ্বলবে আর পুড়বে! পুড়বে আর ছাই হয়ে যাবে!

কিসে রক্ষে পাবে!

দিশেহারা তীরথ-মা।

কে!

কানের কাছে কে যে কি বলছে!

বলছে না!

হ্যাঁ, বলছেই তো সনচরি।

নারীই হোক আর পুরুষই হোক—একজনেরও মনের বিষ নিঃশেষ হয়ে না গেলে বার বার একই ঘটনা ঘটবে নানা ভাবে। নানা জায়গায়।

একটা মানুষের মনের কোণে যদি হিংসার আগুন আক্রোশের আগুন স্বার্থের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে, সে আগুন ছড়িয়ে পড়বে পর পর বহু মনে। একের আগুন শতের মনে।

তখন এক হাতের আগুন দশ হাতেও নেভান যাবে না।

বাইরের আগুন নেভাতে গেলে মনের আগুন আগে নেভান দরকার।

বাইরের আগুন নেভাতে গেলে মনের আগুন নেভাও আগে।

নেভাও নেভাও নেভাও।